বঙ্গসাহিত্যে মেদিনীপুর।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু।

মূল্য—এক টাকা।

প্রকাশক
শ্রীযতীশচন্দ্র বসু।
কাঁথি, মেদিনীপুর।

সন ১৩২২ সাল।

কাঁথি, নীহার প্রেসে
শ্রীমধুসূদন জানা কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

যাঁহারা
আমার শৈশবে ও কৈশোরে
বালসুলভ অসংখ্য ও অসহনীয় অত্যাচার সহ্য করিয়াও
স্নেহের পীযূষ ধারা বর্ষণে
আমার জীবনকে গঠিত করিয়াছেন—
যাঁহাদের স্বর্গগত পূত আত্মা
এখনও অঙ্গুলী সঙ্কেতে আমাকে সংসার পথে
চালিত করিতেছেন—
যাঁহাদের পবিত্র স্মৃতি আমার হৃদয়-পটে
ভক্তির তুলিকায় আজীবন অঙ্কিত থাকিবে
আমার সেই পরমারাধ্য
প্রেমার্ণব মাতামহ
স্বর্গীয় রাখালদাস দত্ত
ও
পরমারাধ্যা মাতামহী
স্বর্গীয়া কৃষ্ণকালী দাসীর
পবিত্র চরণে—
আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি
উৎসর্গ করিলাম।

যোগেশ।

নিবেদন।

বঙ্গসাহিত্যে মেদিনীপুর গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইল। আমি গ্রন্থকার নহি বা গ্রন্থ লিখিবার দুরাশা কখন মনে স্থানও দিই নাই। কাঁথি সারস্বত-সম্মিলনীর মাসিক অধিবেশনে আমি "বঙ্গসাহিত্যে মেদিনীপুর" শীর্ষক যে ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী পাঠ করিয়াছিলাম, তাহা শ্রবণ করিয়া সম্মিলনীর সভাপতি সুলেখক ও সুপণ্ডিত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঘোষাল এম্-এ, প্রমুখ কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ প্রবন্ধটির বিশেষ প্রশংসা করায় আমার অকৃত্রিম সুহৃদমণ্ডলীর নিতান্ত আগ্রহে মৎপ্রকাশিত কাঁথির মাসিক পত্র "সুরভীতে" প্রবন্ধটী পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী দৈনিক পত্র "বেঙ্গলী" ও তীক্ষ্ণদর্শী সমালোচক, প্রাচীন সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহোদয় "সুরভীর" সমালোচনার সময়ে আমার প্রবন্ধটী সম্বন্ধে সন্তোষজনক মন্তব্য প্রকাশ করায় আমার সহোদর-প্রতিম সুহৃদ সুকবি শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ ম.ইতি বি-এ, ইহা গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ করিবার জন্য নিতান্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁহারই অনুরোধে যথেষ্ট দুঃসাহসিকতার সহিত প্রবন্ধটী এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম। তাঁহার মত বন্ধুর স্নেহ ও স্মৃতি যে এরূপে ইহার অঙ্গে জড়িত হইয়া রহিল, ইহা আমার একটী অতীব সুখের বিষয়।

এই পুস্তক প্রণয়ন কালে আমাকে যে সকল গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে তন্মধ্যে স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব", শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণবের সম্পাদিত "বিশ্বকোষ", শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র প্রণীত "বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক" ও বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত "বঙ্গভাষার লেখক" প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠেও বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। স্থানীয় কিংবদন্তী ও প্রাচীন ব্যক্তিগণের প্রদত্ত বিবরণ হইতেও আমি এই গ্রন্থের অনেক বিবরণ সংগ্রহ

করিয়াছি। কাঁথির লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দে মহাশয়, কাঁথির সাপ্তাহিক পত্র "নীহারের" সম্পাদক মান্যবর শ্রীযুক্ত মধুসূদন জানা মহাশয়, নাড়াজোলাধিপতির সুযোগ্য ম্যানেজার, আমার পূজ্যাস্পদ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু মহাশয় ও আমার অনুজ পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ যতীশচন্দ্র বসু এই পুস্তক প্রকাশ ও মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে আমার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। এজন্য আমি কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

পরিশেষে বক্তব্য আমি এই গ্রন্থে যে সকল লেখকের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি তাহা ছাড়া আরও অনেক লেখক মেদিনীপুর জেলায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। কিন্তু আমার অজ্ঞতা নিবন্ধন ও অনুসন্ধানের অল্প প্রসারতা বশতঃ সেই সকল মহাত্মার পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারি নাই। যদি এই পুস্তকখানি বঙ্গীয় সুধীজন কর্তৃক সস্নেহে পরিগৃহীত হয় তাহা হইলে ভবিষ্যতে এই ত্রুটী সংশোধনে যত্নবান হইব। আর এক কথা, বইখানি মফস্বলের প্রেসে ছাপা হওয়ায় এবং রাজকার্য্য উপলক্ষে আমাকে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় বলিয়া আমি নিজে ইহার একখানি প্রুফসীটও দেখিতে পারি নাই। এই কারণে বইখানিতে মুদ্রাকর প্রমাদ অসংখ্য রহিয়া গেল। মনে করিয়াছিলাম একটা শুদ্ধিপত্র দিব; কিন্তু পাছে শুদ্ধিপত্রের আবার একটা শুদ্ধিপত্র প্রয়োজন হয়—এই ভয়ে সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হই নাই। যাহা হউক এক্ষণে এই ক্ষুদ্র লেখকের ক্ষুদ্র পুস্তক সাধারণের নিকট আদৃত হইলে আমার শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি

নন্দীগ্রাম,
১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১। } শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু।

সূচীপত্র।

বিষয় ও পৃষ্ঠা।

—:o:—

বঙ্গসাহিত্যে মেদিনীপুর।

উপক্রমণিকা।

মেদিনীপুর পশ্চিম বঙ্গের একটী প্রধান জেলা বলিয়া পরিগণিত হইলেও অসাড় ও নিশ্চেষ্ট বলিয়া এই জেলার একটী অখ্যাতি বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। কেন যে মেদিনীপুরের এইরূপ দুর্নাম হইল তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। মেদিনীপুরের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস আলোচনা করিলে বরং তাহার বৈপরীত্যই পরিলক্ষিত হয়। কি বৌদ্ধ, কি শৈব, কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব সকল সম্প্রদায়েরই প্রভাব মেদিনীপুরে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ইহার আয়তন যেমন সুবিস্তৃত, বিভবও সেইরূপ সুবিপুল। প্রকৃতিদেবীও ইহাকে মনোহর সাজে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। নিবিড় অরণ্যানী-পরিবৃত শৈলমালা—বিশাল শাল-তাল-পিয়ালাদি মহীরুহ পরিপূর্ণ কাননরাজী—শস্য-শ্যামল সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরভূমি—রাজতহার সদৃশ গিরি নির্ঝরিণী—জনাকীর্ণ জনপদ ও নগর এবং উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুভিত জলনিধি—মেদিনীপুরে সকলই আছে।

মহাভারতে অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গাদি যে সকল দেশের নাম আছে, তথায় মহাভারতোক্ত কীর্ত্তি সকলের পরিচয় পাওয়া যায়। মেদিনীপুরও সে সকল পরিচয় দিতে অসমর্থ নহে। ইহার উত্তর সীমায় বগড়ি (বক্‌ডিহি) পরগণার মধ্যে একচক্রা গ্রামে বক রাজার রাজধানী ছিল। প্রবাদ আছে যে, জতুগৃহ দাহের পর পঞ্চপাণ্ডব যে বক রাক্ষসকে বিনাশ করেন, তাহা এই স্থানেই ঘটিয়াছিল। এই মেদিনীপুর জেলাতেই হংসধ্বজ, তাম্রধ্বজ প্রভৃতি নরপতিগণের রাজধানীও ছিল। তাম্রধ্বজের সহিত যুদ্ধে অর্জ্জুনের পরাজয় এই মেদিনীপুর জেলাতেই ঘটে। তাহার নিদর্শন স্বরূপ কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি আজও তমোলুক নগরীতে বিরাজমান।* কুরুপাঞ্চালীয়

* A List of the Objects of Antiquarian Interest in the Lower Province of Bengal, pp. 23 25.

আরও অনেক ঘটনার সহিত তাম্রলিপ্তের নাম-সংশ্লিষ্ট। মহাভারতের আদি-পর্ব্বে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায়—সভাপর্ব্বে ভীমের দিগ্বিজয় সময়ে—ভীষ্মপর্ব্বে সঞ্জয় কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ জনপদ সমূহের নাম কীর্ত্তনকালে—কর্ণ-পর্ব্বে সঙ্কুলযুদ্ধের প্রসঙ্গে,—প্রভৃতি অনেক স্থলেই তাম্রলিপ্তের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভাতে লক্ষ্যভেদ উদ্দেশ্যে গমন, রাজসূয়যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া সুসজ্জিত সহস্র হস্তী প্রদান এবং পাণ্ডবের সহিত যুদ্ধ সামান্য অবস্থার পরিচায়ক নহে।

পৌরাণিক কালেও তাম্রলিপ্ত নগরী বিশেষ গণনীয় ছিল। বরনগরী তাম্রলিপ্ত বহু পুরাকাল হইতে একটী প্রথিতনামা তীর্থস্থান বলিয়া হিন্দু-শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদিতে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত স্থান একটী সিদ্ধপীঠ বলিয়া পরিগণিত। ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, পূর্ব্বকালে দেবাদিদেব মহাদেব দক্ষযজ্ঞে ব্রহ্মার তনয় দক্ষপ্রজাপতিকে নিহত করিলে পর ব্রহ্মহত্যাবশতঃ দক্ষ-শরীর-বিশ্লিষ্ট-মস্তক মহাদেবের পাণি-সংস্পৃষ্ট হইয়া যায়। মহাদেব উহা কোন প্রকারেই স্বীয় করপল্লব হইতে মুক্ত করিতে অসমর্থ হইয়া, তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য তীর্থযাত্রায় নিরত হ'ন; কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত তীর্থ পরিভ্রমণ করিলেও দক্ষের মস্তক তাঁহার হস্তচ্যুত না হওয়ায় তিনি বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলে, বিষ্ণু বলেন:—

"অহং তে কথয়িষ্যামি যত্র নশ্যতি পাতকং।
তত্র গত্বা ক্ষণান্মুক্তঃ পাপাদ্ভর্গো ভবিষ্যসি॥"

অর্থাৎ যেখানে গমন করিলে জীব ক্ষণকাল মধ্যে পাপ হইতে মুক্ত হয়, এবং সকল পাপ বিনষ্ট হয়, তোমায় সে স্থানের মাহাত্ম্য বলিব। এই বলিয়া বিষ্ণু বলিতেছেন:—

"অস্তি ভারতবর্ষস্য দক্ষিণস্যাং মহাপুরী,
তমোলিপ্তং সমাখ্যাতং গূঢ়ং তীর্থং বরংবসেৎ।
তত্র স্নাত্বা চিরাদেব সম্যগেষ্যসি মৎপুরীং
জগাম তীর্থরাজস্য দর্শনার্থং মহাশয়॥"

অর্থাৎ ভারতবর্ষের দক্ষিণে তমোলিপ্ত নামে মহাতীর্থ আছে, তাহাতে গূঢ় তীর্থ বাস করে। সেখানে স্নান করিলে লোক বৈকুণ্ঠে গমন করে। অতএব আপনি

তীর্থরাজের দর্শনের নিমিত্ত গমন করুন। মহাদেব ইহা শ্রবণমাত্রেই তাম্রলিপ্তে উপস্থিত হইয়া বর্গভীমা ও বিষ্ণু নারায়ণের মন্দিরদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সরসীনীরে অবগাহন করিলে দক্ষ-শিরঃ তাঁহার হস্ত হইতে বিমুক্ত হয়। পদ্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ প্রভৃতিতেও তাম্রলিপ্তের নাম দৃষ্ট হয়। দশকুমার চরিতের ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসের নায়ক মিত্রগুপ্তকে রাজপুত্র ভীমধন্বা এই স্থানেই সাগরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশই প্রাচীন সুহ্ম রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং প্রাচীন তাম্রলিপ্ত নগরীই ওই সুহ্ম রাজ্যের রাজধানী ছিল। ‡

বৌদ্ধযুগেও মেদিনীপুর উন্নতির চরম সীমায় আরোহণ করিয়াছিল। এই যুগেই মেদিনীপুরের অধিবাসীবর্গ সুদূর সিংহল ও যবদ্বীপে গিয়াও আর্য্য উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফা-হিয়ান তাম্রলিপ্ত নগরে দুই বৎসর কাল অবস্থান করিয়া বহু বুদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি ও বহু বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করেন। † খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনদেশীয় অন্যতম পরিব্রাজক হিউন-থ্-সঙ্গও এ প্রদেশের শ্রী-সৌভাগ্যের প্রচুর নিদর্শন দেখিয়া গিয়াছিলেন। § ঐ সময় তাম্রলিপ্ত হইতে ভারতীয় বণিকগণ ভারতীয় শিল্পজাত ও কৃষিলব্ধ সামগ্রী লইয়া পোতারোহণে সুদূর গ্রীস ও রোম দেশে যাইয়াও বাণিজ্য করিতেন। তখন তাম্রলিপ্তের পাদমূল ধৌত করিয়া সুনীল-সিন্ধু চঞ্চল-তরঙ্গ তুলিয়া সফেন উচ্ছ্বাসে বহিয়া যাইত; আর সেই বন্দর হইতে সুবৃহৎ অর্ণবযান সকল সুমন্দ পবনে কেতন উড়াইয়া যাত্রী ও পণ্য লইয়া দেশ বিদেশে যাত্রা করিত। তাম্রলিপ্তের লবণাম্বু বেলা বাঙ্গালীর পোতারোহণ কোলাহলে নিয়ত কলকলায়মান রহিত। বাঙ্গালীর বাণিজ্য-পোত কত দেশের রত্ন ভাণ্ডার স্বদেশে বহন করিয়া আনিত। তাম্রলিপ্তের শ্রেষ্ঠী-সম্প্রদায় শত সৌধ চূড়ায় সে বিভব ছটা বিকীর্ণ করিয়া বাঙ্গালীর পুরুষকার ঘোষণা করিত।

---

‡ "বঙ্গের ভৌগলিক বিবরণ,"— নব্যভারত, অগ্রহায়ণ ১৩১৭ সাল।
† Cowell's Elphinstone, Appendix IX P. 288.
§ Hunter's Orissa, Vol. I. pp. 309-310.

বঙ্গদেশ যখন স্বাধীন ছিল, পালবংশীয় রাজাগণ যখন গৌড়ের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেন, যখন বাঙ্গালী বীরের পদভরে বঙ্গভূমি কাঁপিত, তখনকার অনেক ঘটনার সহিতও মেদিনীপুরের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। এই মেদিনীপুর জেলাতেই ধর্ম্মের অবতার, শান্তমূর্ত্তি, রণনিপুণ, অমিত সাহস লাউসেনের জন্মভূমি। পঞ্জিকায় কলিযুগের রাজচক্রবর্ত্তীগণের তালিকায় এখনও লাউসেনের নাম দৃষ্ট হয়। লাউসেন গৌড়েশ্বরের শ্যালিকা পুত্র। যখন গৌড়ের ভূপতি অজয় নদের তীরবর্ত্তী ঢেকুর রাজ্যের অধীশ্বর ইছাই ঘোষের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া গৌড়ে পলায়ন করেন, তখন এই লাউসেনই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সেই দুর্দ্ধর্ষ ইছাই ঘোষের বধ সাধন করতঃ গৌড়েশ্বরের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। মেদিনীপুরের অন্তর্গত ময়নাগড়ে লাউসেনের জন্ম। রাজবাটীর ভগ্ন প্রাসাদের রাশীকৃত ইষ্টকাবলী এখনও পড়িয়া আছে।

মেদিনীপুরই উড়িষ্যার বিখ্যাত গঙ্গাবংশীয় রাজাদিগের উৎপত্তি স্থান। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে তাঁহারা এ প্রদেশ হইতে যাইয়া উড়িষ্যা জয় করেন।* কালক্রমে তাঁহারা উড়িষ্যায় সাতিশয় প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। গঙ্গাবংশীয় ভূপতিগণ উৎকলের বহির্ভাগেও অনেক স্থান আপনাদের অধীনে আনয়ন করিয়াছিলেন। উত্তরে গঙ্গা, দক্ষিণে গোদাবরী নদী তাঁহাদের রাজ্যাধিকারের সীমাসম্পদীভূত হইয়াছিল। আজ যে উৎকলবাসীরা, একদিন আমাদের রাজ্য গোদাবরী হইতে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন, তাহা এই গঙ্গাবংশীয় রাজন্যবর্গের রাজত্বকালেই ঘটিয়াছিল। গঙ্গাবংশীয় রাজাদিগের রাজত্বকালেই জগন্নাথ দেবের বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হয়।

মুসলমান অধিকার সময়ের অনেক ঘটনার সহিতও মেদিনীপুরের নাম সম্মিলিত আছে। মোগল পাঠানের যে ভীষণ যুদ্ধের পর বাঙ্গালায় মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই বিখ্যাত মোগলমারীর যুদ্ধও এই মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মোগলমারী নামক স্থানে হইয়াছিল। মারহাট্টাদিগের সহিতও মুসলমানদের অনেক যুদ্ধ এই জেলার বক্ষেই হইয়া গিয়াছে। †

---

*Elphinstone's History of India.

† Price's Notes on Midnapur.

খৃষ্টীয় ১৭৫৭ অব্দের স্মরণীয় ঘটনা পলাশীর যুদ্ধের পর নবাব মীর কাশিমের সহিত সন্ধি অনুসারে বাঙ্গালার যে তিনটী জেলা সর্ব্বপ্রথম ইংরাজাধিকারভুক্ত হয়, মেদিনীপুর জেলা তাহার অন্যতম। আবার সমগ্র বঙ্গে যখন ইংরাজাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল, তাহার প্রায় ত্রিশ বৎসর পর পর্য্যন্তও মেদিনীপুর জেলার কিয়দংশে হিন্দু রাজত্ব বর্ত্তমান ছিল। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে দ্বিতীয় মারহাট্টা যুদ্ধের অবসানে ঐ অংশ মারহাট্টাদিগের হস্তচ্যুত হইয়া ইংরাজাধিকারে আইসে।‡

মেদিনীপুরে অনেকগুলি প্রাচীন রাজবংশের বাস আছে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ একশত, কেহ দুইশত, কেহ ছয়শত, কেহবা তদূর্দ্ধকাল অপ্রতিহত প্রভাবে স্ব স্ব অধিকৃত স্থানে এক একটী স্বাধীন রাজার ন্যায় রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর বিলাসস্রোত বঙ্গোপসাগরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া যখন সমগ্র বঙ্গদেশকে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছিল, তখন সেই স্রোতের মুখে পড়িয়া তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই আজ সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে; কিন্তু একদিন তাঁহারাই প্রজাপুঞ্জের ধনপ্রাণ রক্ষক ছিলেন। যখন সুদূর দিল্লীতে মুসলমান সম্রাট একজন সুবাদারের হস্তে বাঙ্গালার শাসনভার সমর্পণ করিয়া যুদ্ধবিগ্রহে বা আমোদপ্রমোদে কালাতিপাত করিতেন, যখন সেই সুবাদার আবার একজন ফৌজদারের উপরে সমস্ত ভার ন্যস্ত করিয়া সুখে মুর্শিদাবাদের প্রাসাদে নিদ্রা যাইতেন, তখন ঐ সকল জমিদারই এক একটী স্বাধীন রাজার ন্যায় শাসনদণ্ড হস্তে করিয়া প্রজাগণের শরীর ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। তাঁহাদের শৌর্য্য, বীর্য্য, প্রভুত্ব ও পরাক্রমে একদিন সমগ্র নিম্নবঙ্গ, সাঁওতাল, কোল, মাঝি, চুয়াড়, খয়রা প্রভৃতি অসভ্য জঙ্গলী জাতিদিগের অত্যাচারের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।¶

মেদিনীপুরই শক্তিসম্পন্ন আর্য্যাবর্ত্তবাসীদিগের দক্ষিণাপথ গমনের দ্বার ছিল। মেদিনীপুরেই সিংহল, সুমাত্রা, প্রভৃতি ভারতসাগরের প্লবমান দ্বীপপুঞ্জে এবং বর্ম্মা ও চীন প্রভৃতি দেশে যাতায়াত করিবার

‡ Price's Notes on Midnapur.

¶ নারায়ণগড় রাজবংশ।

একমাত্র বন্দর ছিল। খৃষ্ট জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই তাম্রলিপ্ত নগর সমুদ্র কূলবর্ত্তী একটী প্রধান বন্দর বলিয়া বিখ্যাত ছিল। পালি ভাষায় লিখিত মহাবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে যে খৃঃ পূঃ ৩১০অব্দে তমোলুক বন্দর হইতেই অর্ণবপোতে বুদ্ধগয়া হইতে আনীত বৌদ্ধদিগের আরাধ্য মহাবোধিদ্রুমের শাখা সিংহলে প্রেরিত হয়। * প্রবাদ আছে যে খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে শাক্যসিংহের দেহাবসান হইলে তাঁহার একটী দন্ত পাটলীপুত্র নগর হইতে আনীত হইয়া দন্তপুর নগরে প্রথমে রক্ষিত হয়, তৎপরে তাম্রলিপ্ত হইতে সমুদ্রযানে সিংহলে নীত হয়। অনেকানেক দেশীয় ও বিদেশীয় প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দাঁতন নগরই, মহাবংশের দন্তপুরী। § মগধ হইতে আসিতে হইলে তৎকালে দাঁতন হইয়া তাম্রলিপ্ত যাওয়াই সুবিধাজনক ছিল। ইহা সমুদ্রযাত্রীগণের একটী বিশ্রাম স্থান ছিল। এক সময় দাঁতন যে বৈদিক ও বৌদ্ধদিগের পবিত্রস্থান ছিল, অদ্যাপি তাহার প্রভূত নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। ¶

এই জেলার মধ্য দিয়া উৎকল গমনের একটী প্রকৃষ্ট পথ বহুকাল ধরিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। খৃষ্টীয় ১৫১০ অব্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যখন নীলাচলে জগন্নাথ দেবের দর্শনার্থ সশিষ্যে উৎকল গমন করেন, তখন তিনিও এই মেদিনীপুর জেলার মধ্য দিয়াই গিয়াছিলেন। গোবিন্দ দাসের কড়চায় লিখিত আছে যে, চৈতন্যদেব এই মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মেদিনীপুর, নারায়ণগড়, দাঁতন, জলেশ্বর প্রভৃতি নগরের মধ্য দিয়া পুরী গমন করিয়াছিলেন। জয়ানন্দ মিশ্রও লিখিয়াছেন,—

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেবনদ পার হৈঞা
উত্তরিলা তাম্রলিপ্তে সেয়াখালা দিঞা।"

অন্যত্র,

"দাঁতন, জলেশ্বর পার হঞা
উত্তরিলা আমরদাঁতে——।"

* বিশ্বকোষ ৩৮৯ পৃষ্ঠা।
§ Antiquities of Orissa Vol. II. pp. 106-107.
¶ উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য,—সারদাচরণ মিত্র,—পৃঃ—১৮।১৯।

কবিবর ভারতচন্দ্র সম্রাট আকবর সাহর বিখ্যাত সেনাপতি রাজা মানসিংহের উড়িষ্যা গমনোপলক্ষে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাতেও এ পথের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,—

"এড়ায়ে মেদিনীপুর নারায়ণগড়ে
দাঁতন এড়ায়ে ডেরা জলেশ্বরে পড়ে।"

সম্রাট সাজাহান ও বাদসাহ ঔরঙ্গজেবও এই পথেই দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়াছিলেন। †

মেদিনীপুর বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত থাকায় ইহা ঐতিহাসিক ও জনশ্রুতি-মূলক নানা উপন্যাস সম্বলিত প্রাচীন গড়, দেবালয়, সুবৃহৎ বাপী, প্রভৃতি প্রাচীন কীর্ত্তিরাশিতে পরিপূর্ণ। ওই সকল কীর্ত্তিরাশির অধিকাংশই আজ কালের বিরাট কবলে পতিত হইলেও মেদিনীপুরের বিজন-পল্লী ও নদী সৈকত এখনও শত শত প্রাচীন কীর্ত্তির দগ্ধ অস্থি ভস্ম বক্ষে ধারণ করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। নয়াগ্রামের খেলার গড়, গোপীবল্লভপুরের চন্দ্ররেখা গড়, কেশিয়াড়ীর করমবেড়ীয়া দুর্গ, কিয়ারচাঁদ প্রান্তরের সহস্রাধিক প্রস্তর স্তম্ভ, তমোলুকের বর্গভীমা দেবীর মন্দির, দাঁতুনের শ্যামলেশ্বরের মন্দির, গড়বেতার সর্ব্বমঙ্গলা ও মহাদেবের মন্দির, কর্ণগড়ের দণ্ডেশ্বর ও মহামায়ার মন্দির এবং কাঞ্চনপুর ও নারায়ণগড়ের মসজিদ দুইটী এখনও লোক-লোচনের বিস্ময়-বিবর্দ্ধিত করিয়া থাকে। ‡ এই জেলার অন্তর্গত দাঁতুন নগরের অনতিদূরে "সরশঙ্কা" নামক যে সুবৃহৎ সরোবরটী স্বচ্ছ দর্পণ-খণ্ডের ন্যায় বিশাল বক্ষঃ বিস্তার করিয়া শোভা পাইতেছে, উহা আয়তনে বঙ্গদেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। দিনাজপুরের মহীপাল দীঘি অপেক্ষা সরশঙ্কা অনেক বৃহৎ ও রমণীয়।

শিল্প ও বাণিজ্যাদি বিষয়েও মেদিনীপুরের গৌরব কম নহে। গঙ্গাবংশীয় রাজগণ যখন এ প্রদেশে রাজত্ব করিতেন, তখন তমোলুকে জাহাজ নির্ম্মাণ হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। § মেদিনীপুরের মাদুর ও রেশমের বস্ত্র

† নারায়ণগড় রাজবংশ, ৪৬ পৃঃ।

‡ List of Ancient Monuments in Bengal.

§ বঙ্গদর্শন ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩১৩ পৃঃ।

একদিন দেশবিদেশে সমাদৃত হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চন্দ্রকোণার বস্ত্র, খড়ারের কাঁসা ও পিতলের বাসন, কেশিয়াড়ীর তসর, ঘাঁটালের গরদ, নারাজোল ও কাশীজোড়ার মাদুর এখনও সুপ্রসিদ্ধ। ইংরাজাধিকারের প্রারম্ভে এ প্রদেশ লবণ কারবারের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ফোর্ট উইলিয়মের অন্তর্গত সমগ্র ব্রিটীশ সাম্রাজ্যে যত লবণ উৎপন্ন হইত, তাহার প্রায় এক তৃতীয়াংশ লবণ কেবল হিজলীতেই উৎপন্ন হইত। * কাশ্মিরী, শিখ, মুলতানী, ভাটীয়া প্রভৃতি নানাদেশের ব্যবসায়ীগণ এই প্রদেশ হইতে লবণ লইতে আসিত। মেদিনীপুরের জঙ্গল মহল হইতে শাল, পিয়াশাল, আবলুশ আদি কাঠ, নানাপ্রকার পশুচর্ম্ম, পাখীর পালক, হরিণের শিং, মোম, মধু, গালা ইত্যাদি কত প্রকার দ্রব্যাদি এখনও কত দেশদেশান্তরে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইতেছে।

মেদিনীপুরের সন্তানভাগ্যও অতিমাত্রায় সমুজ্জ্বল। বর্ত্তমান যুগে মেদিনীপুর জ্ঞানচর্চ্চা ও শিক্ষার উন্নতি সম্বন্ধে বাঙ্গালার অন্যান্য জেলার সমকক্ষ না হইলেও এ জেলায় শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা কম নহে। এই জেলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অলঙ্কার স্বরূপ, নানাশাস্ত্র-বিশারদ, কয়েকজন বিদ্বান্ ও চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্মভূমি। মেদিনীপুর অনেক ধার্ম্মিক ও সুকৃতি সন্তানও প্রসব করিয়াছে।

"দানে চণু, অন্নে মানু, রঙ্গে রাজনারাণ।
বিত্তে ছকু, কীর্ত্তে নরু, রাজা যাদবরাম॥"

প্রভৃতি মহাত্মাগণও এই মেদিনীপুর জেলারই অধিবাসী। খ্যাতনামা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মস্থানও এই মেদিনীপুর। এই অতুল সৌভাগ্য সম্পত্তির অধিকারী হইয়াই আজ মেদিনীপুর সমগ্র ভারতের একটী উচ্চস্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসেও মেদিনীপুরের নাম অবিচ্ছেদ্য। নানাপ্রকার বাহ্য উত্তেজনার প্রবল তরঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াও মেদিনীপুরবাসী যে সাহিত্যসেবার অধিকার হইতে কোন দিন বিচ্যুত হন নাই, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

—:০:—

পদ্য-সাহিত্য।

বৈষ্ণব যুগ।

আর্য্যজাতির প্রথম ভাষা বেদে, তাহার পর রামায়ণাদির ভাষা সংস্কৃত; সংস্কৃতের পর বৌদ্ধদিগের পালি ও গাথা প্রভৃতি প্রাকৃত; চতুর্থ স্তরে বাঙ্গালা, হিন্দি প্রভৃতি গৌড়ীয় ভাষা সমূহ। এই চতুর্থ স্তর হইতে বাঙ্গালা ভাষার আরম্ভ। পণ্ডিতদিগের মতে খৃষ্টীয় ৮০০ হইতে ১২০০ অব্দের মধ্যে প্রাকৃতের যুগ লুপ্ত ও গৌড়ীয় ভাষা সমূহের যুগ উদ্ভূত হইয়াছিল। বৌদ্ধ শক্তির পরাভবে, হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুত্থানে, হিন্দু জাতির নব চেষ্টার স্ফুরণে ও সংস্কৃতের নববিকাশে সেই পরিবর্ত্তন এত দ্রুত হইল, প্রাকৃতের সঙ্গে কথিত ভাষার প্রভেদ এত বেশী হইল যে প্রাচীন ভাষাকে বিদায় দিয়া কথিত গৌড়ীয় ভাষাগুলিকে লিখিত ভাষার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইল। *

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব মন্দীভূত হইতে আরম্ভ হইলে হিন্দুধর্ম্মের এক শাখা অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম জগতে উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রকোষ্ঠে অগ্রসর হইতে লাগিল। অবশেষে প্রেমাবতার চৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়া প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিলেন—যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদত্ত হইল। বঙ্গসাহিত্যের নিরুদ্ধস্রোত চৈতন্যদেবের চরণস্পর্শে নবজীবনের আহ্লাদ সহকারে প্রবাহিত হইয়া উঠিল।

বঙ্গবাসী চৈতন্যদেবকে দেখিবা মাত্রেই চিনিয়া ফেলিল। বাঙ্গালী জাতির সেই আনন্দ, সেই উচ্ছ্বাস, তাহার সমাজ, তাহার ধর্ম্মকে, পরিপ্লাবিত করিয়া উর্দ্ধদিকে বিশ্বপতির সিংহাসন পর্য্যন্ত উত্থিত হইল। বাঙ্গালী তাঁহাকেই পরম প্রেমময়ের শরীরী মূর্ত্তি মনে করিয়া সরল স্থির বিশ্বাসে উন্মত্ত ভাবে স্তুতি, নতি, আরতি, আলিঙ্গন ও বন্দনা করিয়া আস্ফালন করিয়া উঠিল। এক সঙ্গে, একই ভাবে কত শত শত কবি হৃদয় গঠিত হইল। তাঁহারা হৃদয়ের অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস প্রবৃত্তি বসে লেখনী ধারণ করিলেন। বাঙ্গালী বুঝিল শৈব ধর্ম্ম দার্শনিকের, শাক্ত ধর্ম্ম বীর ও কর্ম্মীর, আর এই বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিশেষভাবে কবির।

---

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

বাঙ্গালীহৃদয় মধুরভাবের যত রকম উচ্ছ্বাস গ্রহণ ও বহন করিতে পারে, সংসার সমাজ বিস্মৃত হইয়া বৈষ্ণব কবিগণ তাহাই উপলব্ধি ও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহোদয় তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখিয়াছেন—'বৈষ্ণব সাহিত্য ভালবাসার বিজ্ঞান। ভালবাসা রংজের এরূপ গূঢ়ভেদ আর কোন দেশের সাহিত্যে নাই। লতা যে ক্রম এবং কৌশলে তরুকে জড়াইয়া বশীভূত করে এই বিজ্ঞানে সেই ক্রম লিখিত হইয়াছে।'—প্রাচীন সংস্কৃত ভাগবতাদিতে বৈষ্ণব পন্থা পরিস্ফুট হইয়াছিল; বাঙ্গালী সেই পন্থায় চলিয়া তাহার নিজের ভাবে নিজের ভাষায় এই সকল পরম রসাল কাব্যকথায় গীতি সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। এই সাহিত্যের রাধা কৃষ্ণ বাঙ্গালীর নিজস্ব। বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাদের সাহিত্যে এই রাধাকৃষ্ণেরই পূর্ব্বরাগ, মিলন বিরহ, মান অভিসার, লীলা সম্ভোগ প্রভৃতির মাধুর্য্য বর্ণনা করিয়া প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে পবিত্রতার সুধাধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। আজ ৫০০ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালার গীতিকাব্যকারগণ তাঁহাদের পন্থাতেই চলিয়া তাঁহাদের কথা লইয়াই 'নাড়াচাড়া' করিতেছেন।

বঙ্গসাহিত্যের প্রথমাবস্থায় কাব্যেরই প্রাদুর্ভাব ছিল। একজন খ্যাত-নামা বঙ্গীয় সাহিত্যসেবী লিখিয়াছেন—"নিবিড় কাননকান্তার যেমন মনা-কর্ষণের একমাত্র উপাদান পুষ্প; বালক, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী সকলেই যেমন তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে ও মধুরতায় মুগ্ধ, মানব সমাজের উপর কবিতারও তেমনই কার্য্যকারী মনোমুগ্ধকারিণী ক্ষমতা অন্তর্নিহিত আছে। কিন্তু পুষ্প যেমন দুই দিন পরেই শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে, কবিতার তেমন শৈশব, কৈশোর, বার্দ্ধক্য দশা উপস্থিত হয় না, উহা চিরনবীনা, চির সৌন্দর্য্যে টলটলায়মানা। মানব সমাজকে বিমোহিত ও বিমুগ্ধ করিবার শ্রেষ্ঠ উপকরণ—এই কবিতা সুন্দরী। যে সমাজের এই কবিতা গৌরব করিবার সৌভাগ্য ঘটিয়া উঠে নাই, সে সমাজের ন্যায় মন্দভাগ্য আর কাহার! যে কয়জন মহাত্মা এইরূপে বঙ্গীয় সমাজকে সৌভাগ্যশালী ও গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে কয়েকজন গীতি-কাব্যকার বৈষ্ণব কবি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তাঁহারাই আমাদের বরণীয়, স্মরণীয় ও পূজনীয়।" মেদিনীপুর জেলার বড় সৌভাগ্য, যে সেও কতকগুলি বৈষ্ণব কবির জননী হইতে পারিয়াছে। আমরা তাঁহাদের কথাই প্রথমে আলোচনা করিব।

শ্যামানন্দ।

বৈষ্ণব-যুগের মধ্যভাগে তিন প্রভুর আবির্ভাব হয়: শ্যামানন্দ উৎকলে শ্রীনিবাস মধ্যবঙ্গে এবং নরোত্তম উত্তরবঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন। বৈষ্ণব সমাজে শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্য এক সময়ে যে সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তীকালে শ্যামানন্দ, শ্রীনিবাস ও নরোত্তম সেইরূপ শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহারা বয়সে ছোট বড় হইলেও সমকালিক মহাপুরুষ। বৈষ্ণব সমাজে ইঁহাদের স্থান অনেক উচ্চে। প্রেমবিলাস গ্রন্থে লিখিত আছে (২০শ বিলাস)—

নিত্যানন্দ ছিলা যেই, নরোত্তম হৈলা সেই,
শ্রীচৈতন্য হৈলা শ্রীনিবাস।
শ্রীঅদ্বৈত যাঁরে কয়, শ্যামানন্দ তিঁহো হয়,
ঐছে হৈলা তিনের প্রকাশ॥

শ্যামানন্দ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দণ্ডেশ্বর গ্রামে ষোড়শ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কৃষ্ণ মণ্ডল, মাতার নাম দুরিকা, কনিষ্ঠ সহোদরের নাম বলরাম। কৃষ্ণ মণ্ডল সদ্গোপ সন্তান। ধারেন্দা বাহাদুরপুরে তাঁহার পূর্ব্ববাস ছিল; পরে তিনি সেখান হইতে উঠিয়া আসিয়া দণ্ডেশ্বর গ্রামে বাস করেন। শ্যামানন্দের জ্যেষ্ঠ ভাই ভগিনী কয়েকটী মরিয়া যাওয়ায়, যমের দৃষ্টি না পড়ে এই জন্য বাপ মা ছেলেবেলায় তাহাকে "দুখিয়া" বলিয়া ডাকিতেন। পরে তাঁহার নাম কৃষ্ণ দাস রাখা হয়; তৎপরে বৃন্দাবনে বাস কালে তিনি 'শ্যামানন্দ' আখ্যাপ্রাপ্ত হ'ন। বৈষ্ণব সমাজে তিনি 'শ্যামানন্দ' ও 'দুঃখী কৃষ্ণদাস' উভয় নামেই পরিচিত। শ্যামানন্দের দীক্ষাগুরুর নাম হৃদয়ানন্দ বা হৃদয়চৈতন্য।

যৌবনে বৈরাগী হইয়া শ্যামানন্দ কনিষ্ঠ সহোদর বলরামকে সংসারের ভার দিয়া তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হ'ন। বৈদ্যনাথ, গয়া, বৃন্দাবন, মথুরা, কাশী, প্রয়াগ, দ্বারকা, হরিদ্বার, নৈমিষ্যী প্রভৃতি নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু গৃহে থাকিতে না পারায় তিনি পুনরায় তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইয়া দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে উপস্থিত হ'ন এবং সেখানে শ্রীনিবাস আচার্য্য ও নরোত্তম ঠাকুরের সহিত জীব গোস্বামীর নিকট ভক্তি-

শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই সময় হইতে এই তিনজন প্রীতি-সূত্রে বদ্ধ হইয়া একত্র অবস্থান করিতে থাকেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দকে যাবতীয় ভক্তি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়া জীব গোস্বামী এই তিনজনকে উৎকলে ও গৌড়ভূমে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। বৈষ্ণব গ্রন্থরাজি লইয়া তাঁহারা তিনজনে পঞ্চকোটের দশ বার ক্রোশ দূরবর্ত্তী মালিয়াড়ার নিকট গোপালপুর গ্রামে উপস্থিত হইলে তথা হইতে রাত্রিকালে গ্রন্থের গাড়ীখানি বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বিরের অধীনস্থ দস্যুগণ কর্ত্তৃক অপহৃত হয়। এই দারুণ দুর্ঘটনায় তিনজনেই বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়েন। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তখন ঐ গাড়ীর কোন সন্ধান না পাওয়ায় শ্রীনিবাস আচার্য্য একক গ্রন্থানুসন্ধানের ভার গ্রহণ করিয়া নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে বিদায় দেন। তাঁহারা গোস্বামীর আদেশ মত রাজধানীর প্রান্তভাগে একটী ভজন কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় ভজনানন্দে কালক্ষেপণ করিতে থাকেন।

কিয়দ্দিবস পরে শ্রীনিবাসের নিকট হইতে অপহৃত গ্রন্থোদ্ধারের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া শ্যামানন্দ ও নরোত্তম আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন। জীবগোস্বামীর আদেশ মত শ্যামানন্দ উৎকলে আসিয়া ধর্ম্মপ্রচারে নিরত হ'ন। তখন উৎকলের ধর্ম্মভাব অতি শোচনীয় ছিল—

"উৎকলের সর্ব্বজন পাপে দৃঢ়মতি।
না লয় হরি নাম না শুনে হরি কীর্ত্তি॥
অতিশয় দুষ্ট কর্ম্ম করে নিরন্তর।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব নিন্দা করেন বিস্তর॥
মদ্যপানে মত্ত হয়ে করেন হিংসন।
দণ্ডধারী সন্ন্যাসী বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ॥
ধনলোভে হিংসন করয়ে সাধুজন।
বনভূমি মধ্যে করে এই আচরণ॥
কিবা রাজা প্রজা সবে দুষ্টমতি।"
উড়িষ্যা দেশেতে বৈসে যত মত্ত জাতি॥"

বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার কিয়দংশও তৎকালে উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত ছিল। শ্যামানন্দ এই জেলারই অন্তর্গত গোবিন্দপুর ও শ্যামানন্দপুরেই অধিকাংশ

সময় বাস করিতেন। বাণপুর, পঞ্চটী, নারায়ণগড়, মোহনগড় প্রভৃতি স্থানের শত শত লোক তাঁহার নিকট বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। অনেক দস্যু তস্করও তাঁহার পুণ্যপ্রভাবে নবজীবন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাঁহার অসামান্য সাধুতা ও মহত্ত্ব দর্শনে তৎকালে কেহ তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য বলিয়া মনে করিত না। বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত ভাগবতের টীকাকার প্রসিদ্ধ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য ও জগন্নাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্র নরহরি চক্রবর্ত্তীর প্রণীত "ভক্তি রত্নাকর" নামক গ্রন্থের পঞ্চদশ তরঙ্গে শ্যামানন্দ কর্ত্তৃক উৎকলে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। পুরীতে এখনও শ্যামানন্দের একটী মঠ আছে।

শ্যামানন্দের বিখ্যাত গ্রন্থ "অদ্বৈত-তত্ত্ব"। তিনি ঐ পুস্তকে অদ্বৈত প্রভুর প্রতি মাধবেন্দ্রপুরীর উপদেশ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "উপাসনা-সার সংগ্রহ" ও "বৃন্দাবন পরিক্রমা" নামে তাঁহার আরও দুইখানি গ্রন্থ আছে। এতদ্ব্যতীত শ্যামানন্দের রচিত কয়েকটী পদও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বৈষ্ণবসমাজে কৃষ্ণদাস ও শ্যামদাস নাম দুইটী এত বহুল প্রচলিত যে কোনটী শ্যামানন্দের রচনা তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। আমরা বৈষ্ণব দাসের পদ-কল্পতরু হইতে শ্যামানন্দের রচিত কয়েকটী পদ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তাঁহার রচিত পদাপেক্ষা তাঁহার ভক্তিরসময় জীবনই বেশী সুরভিময়। এই জন্য তাঁহার ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় গ্রন্থই প্রত্যেক নরনারীর আদরের বস্তু।

শ্রীরাগ।

রাই কনক মুকুর কাঁতি।
শ্যাম বিলাসিতে, সুন্দর তনু,
সায়রে কতেক ভাঁতি॥
নীল বসন, রতন ভূষণ,
জলদে দামিনী সাজে।
চাঁচর কেশের, বিচিত্র বেণী,
দুলিছে হিয়ার মাঝে॥
রসের আবেশে, গমন মন্থর,
হেলি দুলি চলি যায়।

আধ ওড়নি, ঈষৎ হাসিয়া,
বঙ্কিম নয়নে চায়॥
সিঁথায় সিন্দুর, নয়নে কাজর
তাহে চন্দনের রেখা।
নব জলধরে, অরুণ কোরে
নবীন চাঁদের দেখা॥
শ্যামানন্দ ভণে, নিকুঞ্জ ভবনে
কলপ তরুর মূলে।
রসের আবেশে, বৈসে বিনোদিনী,
শ্যাম নাগরের কোলে॥

সুহই।

ভুবন আনন্দ কন্দ, বলরাম নিত্যানন্দ
অবতীর্ণ হৈল কলিকালে।
ঘুচিল সকল দুখ, দেখিয়া ও চাঁদমুখ
ভাসে লোক আনন্দ হিল্লোলে॥
জয় জয় নিত্যানন্দ রাম।
কনক চম্পক কাঁতি, অঙ্গুলে চাঁদের পাঁতি,
রূপে জিতিল কোটী কাম॥
ও মুখ মণ্ডল দেখি, পূর্ণচন্দ্র কিসে লেখি
দীঘল নয়ান ভাঙ ধনু।
অজানুলম্বিত ভুজ, তল স্থল পঙ্কজ,
কটি খীন করি অরি জনু॥
চরণ-কমল তলে, ভকত ভ্রমর বুলে,
আধবাণী অমিয়া প্রকাশ।
ইহ কলিযুগ জীবে, উদ্ধার হইল সবে
কহে দীন দুঃখী কৃষ্ণদাস॥

ভৈরবী।

মঙ্গল আরতি যুগল কিশোর।
জয় জয় করতহি সখীগণ ভোর॥

রতন প্রদীপ করে টলমল থোর।
নিরখিতে মুখইন্দু শ্যাম সুগোর॥
ললিতা বিশাখা সখী প্রেম আগোর।
করত নিরমঞ্ছন দোঁহে দুঁহু ভোর॥
বৃন্দাবন কুঞ্জ ভুবন উজোর।
নিরুপম যুগল মুরতি বলি জোর॥
গাওত শুক পিক নাচত ময়োর।
চাঁদ উপেখি মুখ নিরখে চকোর॥
বাজত বিবিধ যন্ত্র ঘন ঘোর।
শ্যামানন্দ আনন্দে বাজায় জয় তোর॥

সুহই।

চিরদিন গোরাচাঁদের আনন্দ অপার।
কহয়ে ভকতগণে পুরব বিহার॥
পুলকে পূরল তনু আপাদ মস্তক।
সোণার কেশর জিনে কদম্ব কোরক॥
ভাবে ভরল মন গদ গদ ভাষ।
অনেক যতনে বিধি পুরায়ল আশ॥
শচীর নন্দন গোরা জাতি প্রাণধন।
শুনি চাঁদমুখের কথা জুড়াইল মন॥
গোরাচাঁদের লীলায় যার হইল বিশ্বাস।
দুখী কৃষ্ণদাস তার দাসানুদাস॥

বৈষ্ণব-সমাজে কথিত বাঙ্গালায় তৎকালে বৃন্দাবনী ভাষা অধিক পরিমাণে মিশ্রিত থাকায় কবিগণ মুখে যাহা বলিতেন, লেখনীতেও তাহাই ব্যবহার করিতেন। এইজন্য তাঁহাদের লেখায় বৃন্দাবনী ভাষার প্রাবল্য কিছু বেশী মাত্রায় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু পদাবলীতে মৈথিল অনুকরণ যেমন মিষ্ট হইয়াছে, কাব্যে কি ইতিহাসে বৃন্দাবনী ভাষা সেরূপ মিষ্ট হয় নাই।

১৫৫২ শকাব্দে (১৬৩০ খৃঃঅব্দে) শ্যামানন্দের তিরোভাব হয়। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর তাঁহার শিষ্য রসিকানন্দ বা রসিকমুরারী শ্যামানন্দী

সম্প্রদায়ের নেতারূপে নির্দ্দিষ্ট হ'ন। রসিকানন্দ গোবিন্দপুর গ্রামে অতি সমারোহে গুরুর মহোৎসব করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তৎকালীন অনেক বৈষ্ণব মহাজন গোবিন্দপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। "শ্যামানন্দ প্রকাশ" ও "অভিরাম লীলা" নামক গ্রন্থে শ্যামানন্দ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত রহিয়াছে।

শ্যামানন্দ বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার সময় যেমন কতকগুলি ভক্তিগ্রন্থ সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন, তেমনই কতকগুলি ভক্ত-শিষ্যও সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। উত্তরকালে তাঁহারা দ্বাদশ শাখায় বিভক্ত হ'ন।

কিশোর, উদ্ধব, আর
পুরুষোত্তম, দামোদর
কাশিয়াড়ীতে এই চারি ঘর।
রসিক মুরারী আর,
রোহিণীতে বাস যার;
ধারেন্দাতে দরিয়া দামোদর।
চিন্তামণি নাম যার,
বড়গ্রামে বাস তার;
বলভদ্র রহে রাজগ্রাম।
হরিহরপুরে ঘর
নাম শ্রীজগতেশ্বর;
সাঁকোয়াতে শ্রীমধুসূদন।
শ্রীগোপী বল্লভপুর,
গোপীনাথের মন্দির;
শ্রীআনন্দানন্দ ভোগরাই।
দ্বাদশ শাখার বাস,
বন্দনায় করি আশ
পাঁচালীতে রচিল সবাই।

এই দ্বাদশটী শাখার মধ্যে ভোগরাই শাখাটী ব্যতীত অন্য সকল শাখাই মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। ভোগরাই ও ১৮৩৬ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ছিল, পরে বালেশ্বর জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

রসিকানন্দ।

শ্যামানন্দের শিষ্যগণের মধ্যে রসিকানন্দের নামই সমধিক প্রসিদ্ধ। বৈষ্ণব-সাহিত্যেও ইঁহার নাম সুপরিচিত। উৎকলে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে রসিকানন্দ শ্যামানন্দের প্রধান সহায় ছিলেন। রসিকানন্দের অপার প্রেম-পারাবার উচ্ছ্বসিত হইয়া সমস্ত উড়িষ্যা ও মেদিনীপুর অঞ্চল প্লাবিত করিয়াছিল। তাঁহার দেহ ও প্রেমময়ী জীবনী ভক্ত পাঠকের হৃদয় ও কর্ণের রসায়ন। তদীয় দেবতুল্য প্রশান্তমূর্ত্তি, অনুপম রূপলাবণ্য ও কারুণ্যবর্ষী উপদেশামৃত শত শত দস্যুবৎ কঠোরমতি পাষণ্ডেরও কলুষিত হৃদয় পরিশোধিত করিয়াছিল।

রসিকানন্দ রাজপুত্র; ইঁহার পিতার নাম অচ্যুতানন্দ, মাতার নাম রাণী ভবানী। ১৫১২ শকে (১৫৯০ খৃঃ অব্দে) কার্ত্তিক মাসে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত রোহিণী গ্রামে রসিকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। "রসিক মঙ্গল" নামক গ্রন্থে রোহিণী গ্রামের নিম্নলিখিত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়:—

"উড়িষ্যাতে আছয় সে মল্লভূমি নাম।
তা'র মধ্যে আছয় রুহিণী নামে গ্রাম॥
কটক সমান গ্রাম সর্ব্বলোকে জানে।
সুবর্ণরেখার তটে অতি পুণ্য স্থানে॥
ডোলঙ্গ বলিয়া নদী গ্রামের সমীপে।
গঙ্গোদক হেন জল অতি রসকূপে॥
রুহিণী নিকটে বারাজীত মহাস্থান।
যা'তে সীতা-রাম-লক্ষ্মণ কৈলা বিশ্রাম॥
দ্বাদশ লিঙ্গ রামেশ্বর শম্ভুবর।
রঘুবংশ কুলচন্দ্র পূজিলা বিস্তর॥
উত্তরবাহিনী ধারা সুবর্ণরেখার।
বারি লৈতে কোটী লোক আইসে তথায়॥
হেন পুণ্য নদী পুণ্য স্থান চারিদিকে।
রুহিণী—বেড়িয়া সবে রহে লাখে লাখে॥

* * * * * *

রাজধানী গড় আছে দেখিতে সুন্দর।
গড় বেড়ি বসতি সে রউনী নগর॥
শত শত বসে তায় দেবতা ব্রাহ্মণ।
বেদ বিদ্যা স্মৃতিশাস্ত্র সন্ধ্যা তরপণ॥
আনন্দে করেন সবে বিদ্যা অভ্যাসন।
বেদধ্বনি চারিদিকে হয় অনুক্ষণ॥
দণ্ডধারী সন্ন্যাসী থাকেন সর্ব্বজন।
বেদজ্ঞ-ব্রাহ্মণ সবে করেন সেবন॥

* * * * *

সেই দেশাধিপতি অচ্যুত মহাশয়।
শান্ত দান্ত ক্ষমাশীল অতি সুহৃদয়॥

* * * * *

ব্রাহ্মণের সেবা ভিন্ন কিছু নাহি জানে।
ব্রাহ্মণ বলিয়া তাঁরে সবাই বাখানে॥
পরহিতকারী বলি জানে সর্ব্বজন।
অচ্যুত মহিমা কিছু না যায় কথন॥
হরিনাম-পরায়ণ সেই মহাশয়।
সর্ব্বভূতে দয়াদর সবারে বিনয়॥
জন্মে জন্মে সে অনেক তপস্যা করিলা।
সে কারণে রসিকেন্দ্র পুত্র জনমিলা॥

* * * * * *

এই হেতু রাহিনীরে করি পরণাম।
রসিকচন্দ্রের জন্ম ধন্য সেই স্থান॥"

রসিকানন্দের পত্নীর নাম ইচ্ছা দেই। ইচ্ছা দেয়ীর পিতা বলভদ্র দাস হিজলীর তদানীন্তন "মণ্ডল অধিকারী" বিভীষণ মহাপাত্রের ভ্রাতুষ্পুত্র। বিভীষণ মহাপাত্র ও তদ্বংশীয়গণ হিজলীর অন্তর্গত বাহিরী গ্রামে বাস করিতেন এবং তথায় রাজার ন্যায় সম্মান পাইতেন। এই প্রদেশে তৎকালে

তাঁহাদের যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। হিজলীর নবাব প্রাতঃস্মরণীয় তাজ খাঁ মসনদরীর দেওয়ান ভীমসেন মহাপাত্র এই বিভীষণ মহাপাত্রের পুত্র। বাহিরীতে এক্ষণে যে প্রাচীন মন্দিরটী ও ভীমসাগর, লোহি সাগর প্রভৃতি সুবৃহৎ পুষ্করিণীগুলি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, তাহার অধিকাংশই ঐ মহাপাত্র বংশের কীর্ত্তি। রসিকানন্দের সমসাময়িক কবি গোপীজনবল্লভ দাস তদ্বিরচিত রসিক মঙ্গল নামক গ্রন্থে রসিকানন্দ ও ইচ্ছা দেইর বিবাহের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতেও বাহিরীর মহাপাত্র বংশের ধনসম্পত্তি ও খ্যাতি প্রতিপত্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়; অধিকন্তু উহার মধ্য হইতে তৎকালীন সমাজের একখানি চিত্রপটও উদ্ধার করিতে পারা যায়। বিবাহের পর রসিকানন্দ অতি অল্পদিন মাত্র সংসারে ছিলেন, তৎপরে তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হ'ন।

নরোত্তম দত্ত খেতুরীতে ছয়টী বিগ্রহ স্থাপন উপলক্ষে মহাসমারোহে যে উৎসব করেন, তাহা বৈষ্ণব সমাজের একটী স্মরণীয় ঘটনা। এই উৎসবে তাৎকালিক সমস্ত বৈষ্ণবমণ্ডলী আহূত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণব-সাহিত্যের অনেক পুস্তকেই এই ঘটনাটী বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন—"এই উৎসব অতীত ইতিহাসের দুর্নিরীক্ষ্য ও অচিহ্নিত রাজ্যের একটী পথপ্রদর্শক আলোক-স্তম্ভ-স্বরূপ; ইহার প্রভাবে আমরা সমাগত অসংখ্য বৈষ্ণবের মধ্যে পরিচিত কয়েকজন শ্রেষ্ঠ লেখককে অনুসরণ করিতে পারি; ইঁহারা ছায়ার ন্যায় ত্বরিতগতিতে আমাদের দৃষ্টি হইতে সরিয়া পড়িলেও সেই ক্ষণিক সাক্ষাৎকারের সুযোগ পাইয়া আমরা তাঁহাদের উত্তরীয় বস্ত্রে ১৫০৪ শক অঙ্কিত করিয়া দিয়াছি; এই উৎসব উপলক্ষে অনেক বৈষ্ণব লেখকের সময় নিরূপিত হইয়াছে।" বহুকাল পরে এই খেতুরীর উৎসবেই শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দ ও নরোত্তম ঠাকুরের আর একবার মিলন হইয়াছিল। খেতুরীতে কিছুকাল অবস্থান করিয়া অম্বিকানগরীতে শ্রীগুরু হৃদয় চৈতন্যের চরণ দর্শন করতঃ শ্যামানন্দ যখন ঘাটশিলায় উপস্থিত হ'ন, সেই স্থানেই রসিকানন্দের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সেই সাক্ষাতের ফলেই রাজপুত্র ভিখারী বৈষ্ণবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। রসিকানন্দ শ্যামানন্দের সহিত নানাদেশে ভ্রমণ

করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। তিনি পরে দেশে ফিরিয়া সুবর্ণরেখা কূলে গোপীবল্লভপুর নামক গ্রাম ও তথাকার প্রসিদ্ধ বিগ্রহ গোপীবল্লভ রায়কে স্থাপন করেন।

রসিকানন্দের চেষ্টায় উৎকলবাসী অসংখ্য নরনারী বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ময়ূরভঞ্জের তদানীন্তন অধিপতি বৈদ্যনাথ ভঞ্জ, নৃসিংহপুরের ভুঞা উদ্দণ্ড রায়, পটাশপুরের রাজা গজপতি, পঞ্চটীর রাজা হরিনারায়ণ, ময়নার রাজা চন্দ্রভানু প্রভৃতি অনেক ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও রসিকানন্দের শিষ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। কথিত আছে এ প্রদেশের তদানীন্তন মুসলমান শাসনকর্ত্তা আহম্মদ বেগও তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন।

রসিকানন্দের "শাখা বর্ণন" ও "রতি বিলাস" নামে দুইখানি গ্রন্থ আছে; এবং তাঁহার রচিত কয়েকটী পদও পাওয়া গিয়াছে। আমরা পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে রসিকানন্দের তিনটী পদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

চব্বিশ বৎসর বয়সে নিমাই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। জননী শচীদেবী এই ভগবৎ-প্রেমোন্মত্ত যুবককে পুত্রবধূর রূপ দ্বারা গৃহে বাঁধিয়া রাখিতে কত চেষ্টা করিলেন— সঙ্গীগণ এই অপূর্ব্ব ভক্তি-উচ্ছ্বসিত পূর্ব্বরাগের আবেশময় যুবককে প্রত্যাবর্ত্তিত করিতে কত উপায় অবলম্বন করিলেন; কিন্তু সকলই ব্যর্থ হইল,—নিমাই সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন। রসিকানন্দের নিম্নোদ্ধৃত দুইটী পদ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের সন্ন্যাস অবলম্বনের পূর্ব্বে শিরোমুণ্ডন উপলক্ষে লিখিত।

ধানশী।

তখন নাপিত আসি প্রভুর সম্মুখে বসি
ক্ষুর দিল সে চাঁচর কেশে।
করি অতি উচ্চরব কান্দে যত লোক সব
নয়নের জলে দেহ ভাসে॥
হরি হরি কিনা হইল কাঞ্চন নগরে।
যতেক নগরবাসী দিবসে হইল নিশি
প্রবেশিল শোকের সায়রে॥
মুণ্ডন করিতে কেশ হৈলা অতি প্রেমাবেশ
নাপিত কান্দয়ে উচ্চরায়।

কি হৈল কি হৈল বলে ক্ষুর আর নাহি চলে
প্রাণ ফাটি বিদরিয়া যায়॥
মহা উচ্চস্বর করি কান্দে কুলবতী নারী
সবাই সবার মুখ চাইয়া।
ধৈরজ ধরিতে নারে নয়ন যুগল-নীরে
ধারা বহে বয়ান বাহিয়া॥
দেখি কেশ অন্তর্দ্ধান অন্তরে দগধে প্রাণ
কান্দিছেন অবধূত রায়।
রসিক নন্দের প্রাণ সদা করে আনচান
ফাটিয়া বাহির হইয়া যায়॥

পাহিড়া।

অহে মধুশীল আমি কি দুঃশীল
কি কর্ম্ম করিনু আমি।
মস্তক ধরিনু পদ না সেবিনু
পাইয়া গোলকস্বামী॥
যে পদে উদ্ভব পতিত পাবনী
তাহা না পরশ হৈল।
মাথে দিনু হাত কেন বজ্রাঘাত
মোর পাপ মাথে নৈল।
যে চাঁচর চুল হেরিয়া আকুল
হইত রমণী মন।
হৈনু অপরাধী পাষাণে প্রাণ বাঁধি
কেন বা কৈনু মুণ্ডন॥
নাপিত ব্যবসায়, আর না করিব
ফেলিনু এ ক্ষুর জলে।
পহুঁ সঙ্গে যাব, মাগিয়া খাইব
রসিক আনন্দ বলে॥

সামান্য কেশচ্ছেদ উপলক্ষে এত বেশী আক্ষেপ আজকালকার দিনে পাঠকের নিকট বিরক্তিকর বোধ হইতে পারে, কিন্তু তখনকার দিনে

শিরোমুণ্ডন একটী ভয়ানক ব্যাপার ছিল। এইজন্য চৈতন্য ভাগবতাদিতে চৈতন্যের শিরমুণ্ডনের সময় শিষ্যগণকে নানারূপ বিলাপ করিতে দেখা যায়। যুবকগণ সে সময় দীর্ঘ কেশ রাখিয়া আমলকী দ্বারা তাহা ধৌত করিয়া পুষ্পাভরণে সজ্জিত করিতেন। এ হেন কেশচ্ছেদ অর্থে তখন চির-দিনের জন্য,—পিতা, মাতা ও স্ত্রীপুত্রের আশাচ্ছেদ বুঝাইত। এই সন্ন্যাস গ্রহণ তখন গৃহস্থের একটী সাধারণ আতঙ্কের কারণ ছিল। সে সময় বঙ্গের বহুসংখ্যক শিক্ষিত যুবক সংসারত্যাগী হইতেন; বহুসংখ্যক পিতা মাতার স্নেহের হৃদয় ছিন্ন করিয়া, গৃহস্থের প্রফুল্লতার দীপটী চিরদিনের জন্য নিবাইয়া যুবকগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন। একবার শিরোমুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাস লইলে তিনি আর সমাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন না।—এইজন্য চৈতন্যদেবের শিরোমুণ্ডন উপলক্ষে এত দীর্ঘ আক্ষেপোক্তির কথা দৃষ্ট হয়।

রসিকানন্দের নিম্নোদ্ধৃত পদটী শ্রীরাধার উক্তি। জ্ঞান দাস, গোবিন্দ দাস, ঘনশ্যাম দাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তাগণের দূতী কর্ত্তৃক শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ বর্ণন-সূচক কয়েকটী সুন্দর সুন্দর পদ আছে। রসিকা-নন্দের এই পদটী তাহারই উত্তর স্বরূপ লিখিত :—

সুহিনী।

শ্রীমত্যুক্তি।

না কহ রে সখি উহার কথা।
দ্বিগুণ হৃদয়ে না দেহ ব্যথা॥
যৈছন চতুর শঠের পহুঁ।
তৈছন তাহার দূতী সে তুহুঁ॥
নিকুঞ্জে হৃদয়ে ধরি লয়ে।
তাহারে সেবউ না কহ এ॥
সোই কলাবতী নিবসে যাঁহা।
তুরিতে গমন করহ তাহা॥
এমতি তাহারে সাধহ যাই।
সে সুখ পাওবি অবধি নাই॥

পুন না আসিহ আমার পাশ।
শুনিয়া চলিল রসিক দাস॥

১৫৭৪ শকে (১৬৫২ খৃঃ অব্দে) ফাল্গুন মাসে "শিব চতুর্দ্দশী অন্তে প্রতিপদ দিনে" বাবট্টি বৎসর বয়সে রসিকানন্দ পরলোক গমন করেন। বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত রেমুনা গ্রামে তাঁহার পবিত্র দেহ সমাহিত করা হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন—

"রেমুনাতে শ্রীগোপাল চরণে।
আসন করিবে মোর নিশ্চে সেই স্থানে॥
অহর্নিশি সংকীর্ত্তন রঙ্গে নিরন্তর।
বেড়ি সদা নাম গায় সব সহচর॥"

রেমুনা বালেশ্বর সহরের পশ্চিমে আড়াই ক্রোশ দূরে, পুরী যাইবার পথে অবস্থিত। এই রেমুনা গ্রামেই প্রসিদ্ধ ক্ষীরচোরা গোপীনাথের মন্দির আছে। ফাল্গুন মাসে গোপীনাথের তের দিন ধরিয়া মেলা হয়। ঐ সময় সেখানে বহু সাধু সন্ন্যাসী ও ভক্ত বৈষ্ণবের সমাগম হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পুরী যাইবার সময় "মহাপ্রসাদ ক্ষীরের" লোভে ক্ষীরচোরা গোপীনাথের মন্দিরে একদিন যাপন করিয়া গিয়াছিলেন। রসিকানন্দের রাধানন্দ নামে পুত্র ও দেবকী নামে এক কন্যা ছিলেন। "রসিক-মঙ্গল" নামক গ্রন্থে রাধানন্দ সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"রাধানন্দ ঠাকুর বন্দো রসিকের সুত।
শ্যামানন্দ প্রিয়শিষ্য সর্ব্বগুণ যুত॥
কৃষ্ণাবেশে প্রেমরসে মুগধ অন্তর।
নয়নের ধারাতে সর্ব্বাঙ্গ জর জর॥
সর্ব্বশাস্ত্রে পরিপূর্ণ অতি সুপণ্ডিত।
সঙ্গীতেতে বিশারদ জগত বিদিত॥

রসিকানন্দের বংশীয়গণ এক্ষণে গোপীবল্লভপুর গ্রামে বাস করিতেছেন। তাঁহারা এক্ষণে সর্ব্বত্র "গোপীবল্লভপুরের গোস্বামী" নামেই সুপরিচিত। বর্ত্তমান ময়ূরভঞ্জাধিপতি ও উড়িষ্যার বহুসংখ্যক প্রসিদ্ধ পরিবার রসিকানন্দ-বংশীয়গণের শিষ্য। গোপীবল্লভপুরের গোস্বামীদের অনেক ব্রাহ্মণ শিষ্যও আছেন। রসিক-মঙ্গল নামক গ্রন্থে রসিকানন্দের বিস্তারিত জীবনী লিখিত আছে।

গোপীজন বল্লভ দাস।

রসিক-মঙ্গল প্রণেতা গোপীজনবল্লভ দাসও এই মেদিনীপুর জেলার অধিবাসী। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় দীনেশ বাবু ইঁহাকে উড়িষ্যাবাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশই তৎকালে উড়িষ্যার অন্তর্গত থাকায় কবিগণ আপনাদিগকে উৎকলবাসী বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় তিনি ওইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়া থাকিবেন। গোপীজনবল্লভ দাস এই জেলার অন্তর্গত নারায়ণগড় থানার এলাকাধীন ধারেন্দা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা রসময় দাস শ্যামানন্দের শিষ্য ছিলেন। রসিক মঙ্গল গ্রন্থে তিনি নিজ পিতা মাতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"চরণে লোটায়া বন্দো রসময় পিতা।
তবে ত বন্দিনু মাতা জীউ পতিব্রতা॥
পতি পত্নী দোঁহে আর পুত্র পাঁচজন।
রসিক চরণে সবে পশিলা শরণ॥
খুল্লতাত বন্দিনু বংশী মথুরা দাস।
আদ্য শ্যামানন্দীতে যাঁহার পরকাশ॥
সব গুরুজন বন্দো করিয়া ভকতি।
মাতৃকুল পিতৃকুল মধ্যে শুদ্ধমতি॥
গোপকুলে যে৷ সবার হইলা উৎপত্তি।
শ্যামানন্দ পদবদ্ধ কুলশীল জাতি॥
গোপীজনবল্লভ হরিচরণ দাস।
মাধব রসিকানন্দ কিশোরের দাস॥
শ্রীরসময় নন্দন ভাই পঞ্চজন।
জাতি ধন প্রাণ যাঁর অচ্যুত নন্দন॥
বল্লভের সুত রাধাবল্লভ বিখ্যাত।
রসিকেন্দ্র চূড়ামণি যার পিতা মাতা॥
সগোষ্ঠী সহিত তারা রসিক কিঙ্করে।
রসিক সঙ্কেতে তারা সতত বিহরে॥"

গোপীবল্লভ দাস রসিকানন্দের শিষ্য ছিলেন। রসিকমঙ্গল গ্রন্থে কবি প্রধানতঃ স্বীয় গুরু রসিকানন্দের চরিত্রই বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীমদ্ভগবদগীতা, শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তি-শাস্ত্রের সারাংশ বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি একখানি গীতিকাব্য। বঙ্গদেশের নিভৃত পল্লীতে চামর-মন্দিরা সহযোগে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, শ্রীগোবিন্দমঙ্গল, শ্রীচণ্ডীমঙ্গল ইত্যাদি গীতিকাব্যের যেরূপ গান হইয়া থাকে উৎকল দেশে রসিকমঙ্গলেরও সেইরূপ গান হইয়া থাকে। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে এই শ্রেণীর অনেক গ্রন্থই রচিত হইয়াছিল। ভক্তি-রত্নাকর, ভক্তমাল, নরোত্তম-বিলাস প্রভৃতি গ্রন্থ এই সময়েই রচিত। ইহাদের সকলগুলিই জীবন-চরিত।

পদাবলী সাহিত্যের ন্যায় এই চরিত-সাহিত্যও এই বৈষ্ণব যুগের অন্যতম অক্ষয় কীর্ত্তি। বৈষ্ণব-যুগে বঙ্গদেশে প্রেমের অবতার আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাই বৈষ্ণব কবিগণ নিষ্কাম প্রেমের মাধুর্য্য ও রূপ সুন্দরভাবে বর্ণন করিতে পারিয়া পদাবলী সাহিত্যে পবিত্রতার সুধা-স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। এই পদাবলী সাহিত্যে তাঁহাদের হৃদয়ের ইতিহাস ও চরিত-সাহিত্যে তাঁহাদের জীবনের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে।

চৈতন্য দেবের মহিমান্বিত আদর্শ হইতে বঙ্গসাহিত্যে জীবন-চরিত লেখার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। তৎপূর্ব্বে মনুষ্যচরিত্র শাস্ত্রীয় যবনিকার পশ্চাতে পড়িয়া উপেক্ষিত ছিল। বঙ্গবাসিগণ পৌরাণিক চরিত্রগুলির দেবদত্ত অমানুষিক শক্তির পরিচয় অবগত হইয়া মনুষ্য-সুলভ গুণের প্রতি অবহেলা করিতে শিখিয়াছিল। তাই চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যে শাস্ত্রীয় অনুবাদ ও শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছুর অবতারণা হয় নাই। মহাপ্রভু নিজের জীবন দেখাইয়া বুঝাইলেন, মনুষ্য-লীলার সৌন্দর্য্যপাতেই শাস্ত্র উজ্জ্বল হয়, ও মনুষ্য শাস্ত্র হইতে মহত্তর। পুস্তকে যে সকল ভাব ও চরিত্রের কথা বর্ণিত হয় মহাজনগণের জীবনে তাহা জীবন্তভাবে ক্রিয়া করে। এই সময় হইতেই চরিত-সাহিত্যের সূত্রপাত। * বঙ্গীয় কবিগণ চৈতন্যদেবের জীবনী লইয়াই চরিত-সাহিত্যের সূত্রপাত করেন। ইহার ফলে বঙ্গসাহিত্যের গৌরব-স্বরূপ চৈতন্য-

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

ভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থগুলি রচিত হয়। পরবর্ত্তী চরিত-সাহিত্যে চৈতন্য প্রভুর পরিষদগণ ও অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। গোপীবল্লভ দাসের রসিকমঙ্গল গ্রন্থখানি এই পরবর্ত্তী বঙ্গসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত।

গ্রন্থখানির অবয়ব নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। ইহাতে পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর এই চারিটী বিভাগ আছে এবং প্রত্যেক বিভাগে ষোলটী করিয়া লহরী আছে। গ্রন্থমধ্যে যতিভঙ্গ, অক্ষরাধিক্য ও চরণ মিলনের বৈষম্য ইত্যাদি নানাবিধ দোষ অনেক স্থলে দৃষ্ট হইলেও গুণ-ভাগের সহিত তুলনায় উহা অতীব লঘু ও তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থ রচয়িতা যে একজন শাস্ত্রনিপুণ প্রেমিক কবি ও অনন্যশরণ ভক্ত ছিলেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত আছে। স্থানে স্থানে তিনি তাঁহার কবিত্ব-শক্তিরও যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে রসিকানন্দের প্রসঙ্গে আমরা এই গ্রন্থ হইতে অনেক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি, সেইজন্য এস্থলে আর কিছু উদ্ধৃত করিলাম না। কতকদিন হইল কলিকাতা সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী হইতে তমোলুকের শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ মিত্রের লিখিত ভূমিকা সম্বলিত রসিকমঙ্গল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থ রচনার সময় সম্বন্ধে কবি গ্রন্থশেষে লিখিয়াছেন :—

"বলভদ্র গজপতি উড়িষ্যার দেশে।
নয় অঙ্ক বসন্ত পঞ্চমী মকরমাসে॥
আজ্ঞা পাঞা আরম্ভ কৈল সে দিবসে।
রসিকচরণ হৃদে করিয়া বিশেষে॥
অষ্ট মাসে দুই বৎসর সে ভাবনা।
রসিকের যশঃকীর্ত্তি করিনু রচনা॥
রবিবার দিন সাঙ্গ হইল পুস্তকে।
বার অঙ্ক কইন্তু পঞ্চমী শুক্লপক্ষে॥"

উড়িষ্যায় তৎকালে রাজার রাজ্যারম্ভ হইতে বৎসর গণনা করা হইত, এবং ঐ এক এক বৎসর এক এক "অঙ্ক" নামে অভিহিত হইত। উড়িষ্যার ইতিহাস হইতে জানা যায় যে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বলভদ্র দেব

উড়িষ্যার সিংহাসনে বিরাজমান ছিলেন। ইঁহার রাজত্বের নবম অঙ্কে কবি তাঁহার গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন, এবং দ্বাদশ অঙ্কে উহা শেষ হয়। গ্রন্থকার স্বয়ং পূর্ব্ব বিভাগের চতুর্থ লহরীতে ১৫১২ শকাব্দে রসিকানন্দের জন্ম হইয়াছে বলিয়া লিখিয়াছেন; আর রচয়িতা যে রসিকানন্দের সমসাময়িক ছিলেন, গ্রন্থ মধ্যে তাহার ভূরি ভূরি উ...ও আছে অতএব গ্রন্থখানি যে কিঞ্চিদুন তিন শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, তাহা সহজে অনুমিত হয়।

গোবর্দ্ধন দাস।

উৎকলে শ্যামানন্দের প্রথম ও প্রধান শিষ্য রসিকানন্দ; দ্বিতীয় শিষ্য দামোদর। এই জেলার কাশিয়াড়ী গ্রামে দামোদর জন্মগ্রহণ করেন। দামোদর সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন; ইঁহার অনেকগুলি শিষ্য ছিল। তন্মধ্যে গোবর্দ্ধন দাস ও বলরামের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা দুই জনেই মেদিনীপুর জেলার অধিবাসী ছিলেন। গোবর্দ্ধন শ্যামানন্দের পরিবারভুক্ত ছিলেন। তাঁহার রচিত সতরটী পদ পাওয়া গিয়াছে। আমরা তন্মধ্যে দুইটি পদ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

শ্রীগান্ধার।

পাল জড় করি, শিশুগণ মেলি;
নামাইল যমুনার জলে।
আনন্দে গোগণ করে জলপান,
পিও পিও সবে বলে॥
উচ্চ পুচ্ছ করি জল পেটে ভরি,
উপরে উঠিল ধেনু।
রাখাল মেলিয়া হুলিয়া হুলিয়া,
ঘন বায় সিঙ্গা বেণু॥
নব তৃণ পাঞা, ধেনু খাইয়া খাইয়া,
ভ্রময়ে যমুনা তীরে।
নন্দের নন্দন করি গোচারণ
সখাগণ সঙ্গে ফিরে॥

বেলি অবসান দেখি বলরাম,
ধেনুগণ লৈয়া সুখে।
কৃষ্ণ মাঝে করি সখাগণ বেড়ি
চলিলা গোকুল মুখে ॥
গোষ্ঠে প্রবেশিয়া গোগণ রাখিয়া
পথেতে মিলিল মায়।
পুত্র কোলে লৈয়া পরাণ পাইলা
দাস গোবর্দ্ধন গায় ॥

বিহাগড়া।

বিহরে শ্যাম নবীন কাম, নবীন বৃন্দা বিপিন ধাম,
সঙ্গে নবীন নাগরীগণ,
নব ঋতুপতি রাতিয়া।
নবীন গান নবীন তান, নবীন নবীন ধরই মান,
নৈতুন গতি নৃত্যতি অতি
নবীন নবীন ভাঁতিয়া ॥
ঈষৎ সরস মধুর হাষ, সরসে পরশে কত বিলাস
রসবতী ধনি রস শিরোমণি,
সরস রভসে মাতিয়া।
সরস কুসুম সরস সুষম, সরস কাননে কেলি ভূষণ
রসে উনমত ঋতুতি কত,
সরস ভ্রমর পাঁতিয়া ॥
মধুর কেলী মধুর মেলি মধুর মধুর করয়ে খেলি,
মধুর যুবতী মাঝে মধুর,
শ্যাম গোরী কাঁতিয়া।
কিবা সে দুহুঁক বদন ইন্দু, তাহে শ্রম জল বিন্দু বিন্দু
আনন্দে মগন দাস গোবর্দ্ধন
হেরিয়া জুরল ছাতিয়া ॥

কানুরাম দাস।

দামোদরের অন্যতম শিষ্য কানুরাম দাস বা কানু দাসও একজন বৈষ্ণব-পদকর্ত্তা। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ধারেন্দা গ্রামে কানুদাস জন্ম-গ্রহণ করেন। রসিকমঙ্গল গ্রন্থের অনেক স্থানে কানু দাসের নামোল্লেখ আছে দেখিতে পাওয়া যায়। কানু দাসের রচিত ১৩টী পদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। আমরা এস্থলে তাহার একটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

ধানশী।

পবনক পরশহি বিচলিত পল্লব
পবদহি সজল নয়ান।
সচকিতে সঘনে নয়নে ধনী নিরখয়ে
জানল আওল কাণ॥
মাধব সমুঝল তুয়া চতুরাই।
তমালক কোরে আপন তনু ছাপই
অব কৈছে রহবি ছাপাই॥
পুনহি বিলম্বে ফিরিবে সব কাননে
পুনঃ অনুমানয়ে চিতে।
ভুলল পথ অন্ত নাহি পাওল
না বুঝিয়ে নাগর রীতে॥
নূপুর রণিত কলিত নব মাধুরী
শুনাইতে শ্রবণ উল্লাস।
আও সরি রাই কাননে অবলোকই
কহতহি কানুরাম দাস॥

বাসুদেব ঘোষ।

বাসুদেব ঘোষ বা বাসু ঘোষ বৈষ্ণব-যুগের একটী উজ্জ্বল রত্ন। দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন—"গৌরাঙ্গ সম্বন্ধীয় পদাবলী রচয়িতাগণের মধ্যে বাসুদেব শীর্ষস্থানীয়।" বাসু ঘোষ এই জেলার অধিবাসী না হইলেও এই জেলাতেই তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কাল ব্যয়িত হওয়ায় এবং এই জেলাতেই অবস্থান কালে তাঁহার পদাবলী ও গ্রন্থনিচয় রচিত হওয়ায় আমরা এস্থলে তাঁহার নামোল্লেখ করিলাম।

বাসু ঘোষের পিতার নাম বল্লভ ঘোষ। ইঁহাদের পূর্ব্ব নিবাস কুমারহট্ট; কিন্তু কেহ কেহ বলেন, শ্রীহট্টের বুড়ণ গ্রামে মাতুলালয়ে বাসু ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। বাসু ঘোষের মাধব ও গোবিন্দানন্দ নামে অন্য দুই সহোদর ছিলেন। এই তিন ভ্রাতা শেষে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। তিন ভ্রাতাই বিখ্যাত কীর্ত্তনিয়া ও মহাপ্রভুর অনুরক্ত অনুচর ছিলেন। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের পর হইতে বাসুদেব এই জেলার অন্তর্গত তমোলুক নগরে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তিনি তাঁহার অপর দুই ভ্রাতা গোবিন্দ ও মাধবের ন্যায় সুকবি ও সুপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার রচিত পদাবলী অতি সুন্দর ও মধুর ভাবপূর্ণ এবং অতি সরল ভাষায় রচিত। বিশেষতঃ বাসু ঘোষ গৌরাঙ্গ প্রভুর অনুচর রূপে বর্ত্তমান থাকায় তাঁহার পদাবলীর মূল্য ঐতিহাসিক হিসাবে যে অত্যধিক তাহা বলাই বাহুল্য। বাসু ঘোষের কয়েকটী পদ এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

করুণ বিভাস।

শচীর মন্দিরে আসি দুয়ারের পাশে বসি
ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।
শয়ন মন্দিরে ছিলা নিশিভাগে কোথা গেলা
মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া ॥
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে, নিদ্রা নাহি দুনয়নে,
শুনিয়া উঠিল শচী মাতা।
আউদর কেশে ধায়, বসন না রহে গায়
শুনিয়া বধূর মুখের কথা ॥
ত্বরিতে জ্বালিয়া বাতি দেখিলেন ইতি উতি
কোন ঠাঁই উদ্দেশ না পাইয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ সাথে কান্দিতে কান্দিতে পথে
ডাকে শচী নিমাঞি বলিয়া ॥
শুনিয়া নদীয়ার লোকে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে শোকে
যারে তারে পুছেন বারতা।
একজন পথে যায় দশজন পুছে তায়
গৌরাঙ্গ দেখেছ যাইতে কোথা ॥

সে বলে দেখেছি পথে কেহ তো নাহিক সাথে
কাঞ্চননগর পথে ধায়।
কহে বাসুদেব ভাষা শচীর এমন দশা
পাছে জানি মস্তক মুড়ায়॥

শ্রীরাগ।

কাঞ্চননগরে এক বৃক্ষ মনোহর।
সুরধনী তীরে ছায়া শীতল সুন্দর॥
তার তলে বসিয়াছেন গৌরাঙ্গ সুন্দর।
কাঞ্চনের কান্তি যিনি দীপ্ত কলেবর॥
নগরের লোক ধায় যুবক যুবতী।
সতী ছাড়ে নিজ পতি জপ ছাড়ে যতি॥
কাঁকে কুম্ভ করি নারী দাঁড়াইয়া রয়।
চলিতে না পারে যেই নড়ী হাতে ধায়॥
কেহ বলে কেন নাগর কোন দেশে ছিল।
সে দেশে পুরুষ নারী কেমনে বাঁচিল॥
কেহ বলে নিজ নারীর গলে পদ দিয়া।
আসিয়াছে জননীর পরাণ বধিয়া॥
কেহ বলে ধন্যা মাতা ধৈরাছিল গর্ভে।
দেবকী সমান যেন শুনিয়াছি পূর্ব্বে॥
কেহ বলে কোন নারী পেয়েছিল পতি।
ত্রৈলোক্যে তাহার সমান নাহি ভাগ্যবতী॥
কেহ বলে ফিরে যাও আপন আবাসে।
সন্ন্যাসী না হও বাছা না মুড়াও কেশে॥
প্রভু বলে আশীর্ব্বাদ কর মাতা পিতা।
সাধ কৃষ্ণ পদে বেচিব মোর মাথা॥
হেনকালে কেশব ভারতী মহাশয়।
দেখিয়া তাহারে প্রভু করিলা প্রণতি॥
কৃষ্ণদাস কয় গোসাঞি দেও ভক্তিবর।
বাসুদেব কহে মুণ্ডে পড়িল বজর॥

পাহিড়া ।

হরি হরি কিনা হৈল নদীয়া নগরে ।
কেশব ভারতী আসি বজর পাড়িল গো
রসবতী পরাণের ঘরে ॥
গিরি পুরী ভারতী আসিয়া করিল যতি
আঁচলে রতন কাড়ি নিল ।
প্রিয় সহচরী সঙ্গে যে সাধ করিনু রঙ্গে
সে সব স্বপন মম ভেল ॥
কিশোর বয়স বেশ মাথায় চাঁচর কেশ
মুখে হাসি আছে মিশাইয়া ।
আমরা পরের নারী পরাণ ধরিতে নারি
কেমনে বাঁচিবে বিষ্ণুপ্রিয়া ॥
সুরধনী তীর তরু কদম্ব খণ্ডিতে বরু
প্রাণ কাঁদে কেতকী দেখিয়া ।
নদীয়া আনন্দ ছিল গোকুলের পারা হৈল
বাসু ঘোষ মরয়ে কান্দিয়া ॥

গান্ধার ।

পূরবে কান্দিল চূড়া এবে কেশ হীন ।
নটবর বেশ ছাড়ি পরিলা কৌপীন ॥
গাভী দোহন ভাণ্ড ছিল বাম করে ।
করঙ্গ ধরিলা গোরা সেই অনুসারে ॥
ত্রেতায় ধরিলা ধনু দ্বাপরেতে বাঁশী ।
কলিযুগে দণ্ড ধরি হৈলা সন্ন্যাসী ॥
বাসু ঘোষ কহে শুন নদীয়া নিবাসী ।
বলরাম অবধূত কানাই সন্ন্যাসী ॥

বাসু ঘোষ "গৌরাঙ্গ চরিত" ও "নিমাই সন্ন্যাস" নামক দুইখানি গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। এই উভয় গ্রন্থেই সংকীর্ত্তনোপযোগী ছন্দে সহজ সুললিত ও মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় যথাক্রমে গৌরাঙ্গ-চরিত ও তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের কথা বর্ণিত আছে। কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে বাসুদেব ঘোষ মানবলীলা সম্বরণ করেন।

১৪৫৫ শকাব্দে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের অন্তর্দ্ধান হইলে বাসুদেব ঘোষ অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া তমোলুকে মহাপ্রভুর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া শোকের সান্ত্বনা করেন। তাঁহার স্থাপিত গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মূর্ত্তি এখনও তমোলুকে বিরাজিত আছেন। তমোলুক, সুজামুঠা, দোরো ও কাশীজোড়ার রাজা প্রভৃতি বড় বড় জমিদারগণ ইঁহার সেবাদি সুচারুরূপে নির্ব্বাহের জন্য বিস্তর ভূমি সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। নীলাচল দাস প্রণীত "দ্বাদশপাঠ নির্ণয়" নামক গদ্য পদ্যময় ক্ষুদ্র পুঁথিতে তমোলুকে বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের পাটের বিবরণ লিখিত আছে।

দুঃখী শ্যামদাস।

শ্যামানন্দের অন্যতম শিষ্য শ্যামদাসও একজন সুকবি ছিলেন। তিনিও গুরুর ন্যায় আপনাকে 'দুঃখী' নামে পরিচিত করিতে ভালবাসিতেন। এই কারণে অনেকেই এই দুইজনকে একব্যক্তি বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ ইঁহারা দুইজনেই মেদিনীপুর জেলার অধিবাসী হওয়ায় তাঁহারা ইঁহাদের দুইজন যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি তাহা কল্পনাও করেন নাই। ১৩০৮ সালের চৈত্র মাসের "নব্যভারতে" শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্-এ, মহাশয়ের লিখিত "দুঃখী শ্যামদাস" শীর্ষক যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছিল উহা পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে তিনিও এই দুইজনকে একই ব্যক্তি বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। ক্ষীরোদ বাবু যদিও ঐ প্রবন্ধে শ্যামানন্দের কথাই লিখিয়াছেন, কিন্তু শ্যামানন্দের কথা লিখিতে গিয়া, তিনি শ্যামানন্দের রচিত বলিয়া যে কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন, তাহার সকলগুলিই এই দুঃখী শ্যামদাসের রচিত; কেবল "রাই কনক মুকুর কাঁতি" শীর্ষক পদটি যাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে শ্যামানন্দের প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি, উহাই শ্যামানন্দের নিজস্ব।

ক্ষীরোদ বাবু লিখিয়াছেন—"উৎকল দেশে শ্যামানন্দের আটচল্লিশখানি গ্রন্থ প্রচলিত আছে। পুরীতে দুইটী মঠ আছে।" এই আটচল্লিশখানি গ্রন্থের অধিকাংশই এই দুঃখী শ্যামের, শ্যামানন্দের নহে। পুরীর দুইটী মঠেরও একটির নাম দুঃখী শ্যামের মঠ, আর একটী, শ্যামা-

নন্দের মঠ বলিয়া পরিচিত। পরবর্ত্তীকালে ক্ষীরোদ বাবুও তাঁহার ভ্রমটা কতকটা বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়াই যেন আমাদের মনে হয়। ১৩১২ সালের কার্ত্তিক মাসের "নব্যভারতে" তিনি "দুঃখী শ্যামদাস" শীর্ষক আর একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধটীতেও সেই শ্যামানন্দের জীবনী লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এবার তিনি যে কয়েকটী পদ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন, উহার সকলগুলিই শ্যামানন্দের রচিত, দুঃখী শ্যামের নহে। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার এই প্রবন্ধের নামকরণ সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি আছে। তিনি লিখিয়াছেন—"বৈষ্ণব-জগতে তিনি (শ্যামানন্দ) দুঃখী কৃষ্ণদাস ও দুঃখী শ্যামদাস উভয় নামেই সুপরিচিত।" একথা তিনি কোথায় পাইলেন? বৈষ্ণব-সাহিত্যে তিনি দুঃখী কৃষ্ণদাস ও শ্যামানন্দ এই দুই নামেই পরিচিত। শ্যামানন্দ কোন স্থানেই "দুঃখী শ্যামদাস" নামে পরিচিত নহেন। ক্ষীরোদ বাবু এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ দেন নাই বরং তিনি শ্যামানন্দের যে কয়েকটী পদ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন উহার সকল গুলিতেই দুঃখী কৃষ্ণদাস ও শ্যামানন্দের ভণিতাই আছে। দুঃখী শ্যামদাসের কোন ভণিতাই নাই। তিনি নিজেও লিখিয়াছেন— "তাঁহার (শ্যামানন্দের) দৈন্য দেখিয়া ভাগবত গোষ্ঠী তাঁহাকে দুঃখী কৃষ্ণদাস বলিয়া ডাকিতেন। কেহ কেহ বলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভাই ভগিনীগুলি মরিয়া যাওয়াতে যমের দৃষ্টি না পড়ে এইজন্য বাপ মা ছেলে বেলায় তাঁহাকে 'দুঃখিয়া' বলিয়া ডাকিতেন। কৃষ্ণ অনুরাগের আধিক্য দেখিয়া হৃদয়ানন্দ বা হৃদয় চৈতন্য প্রভু অম্বিকানগরে মন্ত্র দিবার সময় তাঁহাকে শ্যামানন্দ উপাধি দিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে বৃন্দাবনের জীব গোস্বামী এই উপাধি দান করেন।" তবে ক্ষীরোদ বাবু নিজে দুঃখী শ্যামদাস নামটী কোথা হইতে পাইলেন এবং ওই প্রবন্ধের নামটিও কেন যে "দুঃখী শ্যামদাস" রাখিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। দীনেশ বাবুও লিখিয়াছেন—"বাল্যকালে ইঁহাকে (শ্যামানন্দকে) সকলে "দুঃখী" বলিয়া ডাকিত। তৎপরে কৃষ্ণদাস ও বৃন্দাবনে বাস কালে "শ্যামানন্দ আখ্যা প্রাপ্ত হ'ন।" তাহা হইলে দেখা যাইতেছে শ্যামানন্দ কখনও দুঃখী শ্যামদাস নামে পরিচিত ছিলেন না।

দুঃখী শ্যামদাস ভিন্ন ব্যক্তি। শ্যামানন্দের সহিত তাঁহার এক গুরু শিষ্য সম্বন্ধ ব্যতীত আর অন্য কোন সম্বন্ধ ছিল না। ইনি ভরদ্বাজ গোত্রীয় দে-বংশীয় কায়স্থ। দুঃখী শ্যাম তাঁহার প্রকৃত নাম; দাস ভক্তিব্যঞ্জক উপাধি মাত্র। দুঃখী শ্যামের ন্যায় মহাভারত রচয়িতা কাশীরাম ও দে বংশীয় কায়স্থ ছিলেন; তিনিও ইঁহার ন্যায় তাঁহার নামের সঙ্গে সর্ব্বত্র দাস শব্দ যুক্ত করিয়া কাশীরাম দাস নামে খ্যাত হইয়াছেন।

মেদিনীপুর সহরের আট ক্রোশ পূর্ব্বে কেদার কুণ্ড পরগণার মধ্যে হরিহরপুর নামে এক গ্রাম আছে। দুঃখী শ্যামদাস সেই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীমুখ, মাতার নাম ভবানী। তাঁহার পুত্র ও পৌত্রাদির কোন পরিচয় তাঁহার গ্রন্থে বা অন্য কোথাও পাওয়া যায় নাই; তাহা না হইলেও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থকারের বংশের কোন লোককে যেমন পাওয়া যায় না, দুঃখী শ্যামের সেরূপ নহে। ইংরাজদিগের রাজত্বের প্রথমে দশশালা বন্দোবস্তের সময় দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর প্রভৃতি নাখেরাজ ভূমির নূতন নূতন সনন্দ দেওয়া হয়। তখন দুঃখী শ্যামের বংশে গৌরাঙ্গ অধিকারী নামে একজন সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী এক বংশধর এখনও তাঁহার বাস্তুতে তাঁহার কীর্ত্তি মহীরুহের মূল রক্ষা করিতেছেন। ইনি দুঃখী শ্যামের পিতা হইতে প্রায় দ্বাদশ পুরুষ অন্তর। দুঃখী শ্যামের বংশের একটী বিশেষ ঘটনা এই যে, এই দ্বাদশ পুরুষ পর্য্যন্ত তদ্বংশের কেবল একটী করিয়া পুরুষ (প্রায়ই কনিষ্ঠ সন্তান) জীবিত থাকিয়া বংশ-প্রবাহ রক্ষা করিতেছেন। এইজন্য তাঁহার বংশের শাখা প্রশাখার বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

দুঃখী শ্যামের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "গোবিন্দ মঙ্গল"। তিনি ঐ গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধোক্ত শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলাময় কাহিনী নানা ছন্দ বৈচিত্র্যে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় দৈবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ চরিত। প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে শৌনকাদি ঋষি ইহাই প্রশ্ন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের কথায় অবতারণা করেন। আনুষঙ্গিক ভগবানের অন্যান্য অবতার ও সাধু ভক্তদিগের বৃত্তান্ত উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ লীলার আদি অবধি অধিকাংশ উল্লিখিত হইয়াছে। দুঃখী শ্যাম

সেই দশম স্কন্ধকে প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া এবং প্রথম দুই স্কন্ধ ও শেষ স্কন্ধ হইতে প্রয়োজনীয় কথা লইয়া "গোবিন্দ মঙ্গল" নাম দিয়া এই ভাগবতার্থ প্রকাশ করেন। কৃত্তিবাস ও কাশীরাম যেমন স্বীয় স্বীয় অবলম্বিত গ্রন্থের সঙ্গে অন্যান্য পুরাণাদির কথাও মিশ্রিত করিয়াছেন, দুঃখী শ্যামও সেইরূপ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণাদি হইতে কোনও কোনও কাহিনী গ্রহণ করিয়া ভাগবতার্থ পরিস্ফুটিত করিয়াছেন।

গোবিন্দ মঙ্গলের রাধিকার প্রসঙ্গ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের অন্তর্গত। ভাগবতে রাধার কথা নাই। বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছেন—"ভাগবতে কেন, বিষ্ণু পুরাণে, হরিবংশে বা মহাভারতে কোথাও রাধার নাম নাই। অথচ এখনকার কৃষ্ণ উপাসনার প্রধান অঙ্গ রাধা। রাধা ভিন্ন এখন কৃষ্ণ নাম নাই। রাধা ভিন্ন এখন কৃষ্ণের মন্দির নাই বা মূর্ত্তি নাই। বৈষ্ণবদিগের অনেক রচনায় কৃষ্ণ অপেক্ষাও রাধা প্রাধান্যলাভ করিয়াছেন। যদি মহাভারতে, হরিবংশে, বিষ্ণুপুরাণে বা ভাগবতে 'রাধা' নাই, তবে এ 'রাধা' আসিলেন কোথা হইতে?" দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন— "এই দেবী প্রথমতঃ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ও আর কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আশ্রয় করিয়া শুভদিনে আর্য্যাবর্ত্তের দেব-মণ্ডপে প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন; চির শ্রদ্ধেয় দেবদেবীগণ প্রকৃতির এই আভরণ-হীনা নগ্ন-সৌন্দর্য্যময়ীর অন্তরালে পড়িয়া গেলেন; সদ্য-চ্যুত অনাঘ্রাত মালতী পুষ্পের ন্যায় এই দেবীকে পাইয়া কবি ও ভক্ত আনন্দিত হইল; চিরারাধ্যা দুর্গা, কালীর উদ্দেশ্যে আহৃত পুষ্পমালা শ্রীরাধিকার কণ্ঠে দোলাইয়া দিল। বঙ্গদেশে কুসুম সিংহাসনে, ফুল্ল পঙ্কজ ও চন্দনার্দ্র তুলসী-দলে সজ্জিত হইয়া শ্রীরাধিকা অধিষ্ঠিত হইলেন; প্রাচীন বঙ্গীয় সাহিত্যের সার-সৌন্দর্য্য তাঁহারই চরণ-কমলের সুগন্ধি। রাই কানু নাম বঙ্গ-সাহিত্য হইতে বাদ দিলে, এই দেশের অতীত ও ভাবী শত সহস্র উৎকৃষ্ট গীতি কবিতার শিরে বজ্রাঘাত করা হয়; এই দেশে এই সব গীতির তুল্য মনোহারী কিছু হয় নাই।"

শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য প্রণেতা মালাধর বসু বঙ্গসাহিত্যে প্রথম রাধার অবতারণা করেন। দোললীলা অধ্যায়ে কবি এই নূতন সৌন্দর্য্যের রেখাপাত করিয়াছেন। আমরা দেখিতেছিলাম ভাগবতের গোপীগণ এতদিন শ্রীকৃষ্ণকে

কেবল দেবতা ভাবিয়াই পূজা করিয়া আসিতেছেন—আর শ্রীকৃষ্ণও এতদিন তাঁহাদিগকে কেবল প্রেম দিয়াই অনুগৃহীত করিতেছেন; কিন্তু কবি দেখাইলেন অন্যরূপ। তাঁহার গোপীগণ কেবল যে শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিয়াই ক্ষান্ত আছেন তাহা নয়, তাঁহারা তাঁহার সঙ্গে কৌতুকও করিতেছেন, আবার সময় সময় মানভরে গালিও দিতেছেন। অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ তাঁহাদিগকে প্রেম দিয়া অনুগৃহীত করিতেছেন, সেইরূপ প্রেম পাইয়া নিজেও অনুগৃহীত হইতেছেন। ভালবাসার মাহাত্ম্যে আরাধ্য ও আরাধকের এই গূঢ় চিত্ত-সংযোগ শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে অভিনব বস্তু। তুল্য জ্ঞান না হইলে হাত বাড়াইয়া ফুল্ল-ফুলটী পদে রাখিয়া আসা যায় মাত্র, কিন্তু বাহু জড়াইয়া আলিঙ্গন করা যায় না। ভক্তের মত ভক্ত হইলে দেবতা ও ভক্তের আসন একস্থানে, কারণ ভক্ত ভিন্ন দেবতা কাষ্ঠ-পুত্তলি মাত্র। ভাগবতের এই অসম্পূর্ণ অংশ মালাধর বসুই পূরণ করেন।* পরবর্ত্তী কালে শত শত কবিগণ শত সহস্র কবিতা ও কাব্যে সেই মাধুর্য্যেরই বিকাশ করিয়াছেন।

দুঃখী শ্যাম দাস তাহার রাধিকার কথা ও গোপীগণের ভাব এই শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় কাব্য হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণ বিজয় খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে (১৩৯৫ শকে) রচিত হয়; অনুমান ইহার প্রায় দেড় শত বৎসর পরে গোবিন্দ মঙ্গল গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। গোবিন্দ মঙ্গলের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ও ভাগবতের অনুবাদ। ইহাতে ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ আছে। শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের কবি সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এই জন্য মূল গ্রন্থের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের যতটা ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়, গোবিন্দ মঙ্গলের সঙ্গে ততটা ঐক্য পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু অন্যদিক দিয়া দেখিতে গেলে গোবিন্দ মঙ্গলের কবির স্থান শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের কবির বড় নিম্নে হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। নিম্নে উদাহরণ রূপে একটী স্থান উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণের মুরলী রবে গোপীগণের আগমন।

মূল হইতে অনুবাদিত ;—

"কোন কোন গোপাঙ্গনা গো দোহন করিতেছিল, তাহারা দোহন

---

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সমুৎসুক হইয়া গমন করিল। অন্যান্য গোপী অন্ন পাকানন্তর মহানসে রাখিয়া স্থালীস্থ জল নিঃসারণ করিতেছিল, সমুদয় ক্বাথ নির্গম প্রতীক্ষা করিতে পারিল না। অপরা গোপী গোধুম কণন্না রন্ধন করিতেছিল পক্ব অন্ন না নাবাইয়াই চলিল। কোন কোন গোপী গৃহে অন্নাদি পরিবেশন করিতেছিল, কেহ কেহ শিশুদিগকে দুগ্ধ পান করাইতেছিল, অন্য কয়েক জন পতিশুশ্রূষায় রত ছিল, তাহারা তত্তৎ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া গেল। অন্য গোপাঙ্গনাগণ ভোজন করিতেছিল, গীত শুনিবামাত্র আহার ত্যাগ করিয়া চলিল।" (১০ম স্কঃ ২৯ অঃ)

শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে;—

"সবার হৃদয়ে কানু প্রবেশ করিয়া।
বেণু দ্বারে গোপীচিত্ত আনিল হরিয়া॥
ছাওয়ালের স্তন পান করে কোন জন।
নিজ পতি সঙ্গে কেহ করেছে শয়ন॥
গাভী দোহায়েন্ত কেহ দুগ্ধ আবর্ত্তনে।
গুরুজন সমাধান করে কোন্থ জনে॥
ভোজন করএ কেহ করে আচমন।
রন্ধনের উদ্যোগ করএ কোন্থ জন॥
কার্য্য হেতু কেহ কারে ডাকিবারে যায়।
তৈল দেহি কোন্থ জন গুরুজন পাএ॥
কেহ কেহ পরিবার জনেরে প্রবোধে।
কেহ ছিল কার কার্য্য অনুরোধে॥
হেনহি সময়ে বেণু শুনিল শ্রবণে।
চলিল গোপিকা সব যে ছিল যেমনে॥"

গোবিন্দ মঙ্গলে;—

"বৃন্দাবিপিনের মাঝে সঙ্কেত মুরলী-বাজে
শুনিয়া মোহিত গোপনারী।
তেয়াগিয়া গৃহ কাজ চলিল নিকুঞ্জ মাঝ
মুরলীর নাদ অনুসরি॥

শ্যামতনু অপরূপী ষোল সহস্রেক গোপী
বাজে বংশী সবাকার নামে।
শুনিয়া মুরলী স্বান চকিত চঞ্চল প্রাণ
তনু জর জর ভেল কামে॥
গৃহে এক গোপনারী গোরস নিয়োগ করি
কানুর মুরলী তারে ডাকে।
শুনিয়া মোহন বেণু ধরিতে না পারে তনু
চলে বেগে বৃন্দাবন মুখে॥
এক গোপী নিজ ঘরে বসিয়া ভোজন করে
তার নামে মুরলী ডাকিল।
শ্যাম গুণে মোহমতি চলিল সে দ্রুতগতি
হাত পাখালিতে না পারিল॥
চুলীতে বসায়ে দুগ্ধ এক গোপী হৈলা মুগ্ধ
বাজে বাঁশী তার নাম ধরি।
উন্মত্ত মদন বাণে চলে সে কানুর স্থানে
গৃহকর্ম্ম দূরে পরিহরি॥
ব্রজবালা একঘরে সুরভি দোহন করে
মোহন মুরলী ডাকে তায়।
শুনি প্রাণ নাহি বান্ধে বাছুরি রহিল ছান্দে
বৃন্দাবনে চলিল ত্বরায়॥
বসিয়া স্বামীর স্থানে চরণ করে সেবনে
তার নামে মুরলী ডাকিল।
শুনিয়া মুরলী গীত মোহিত হইল চিত
পতিপদ ফেলিয়া চলিল॥
এক গোপী নিজ ঘরে নয়নে অঞ্জন পরে
বাজে বাঁশী তার নাম ধরি।
না পারে অঞ্জন পরি চঞ্চল হইয়া চলি
কজ্জলের পাত্র হাতে করি॥

বসন পরিতে কেহ মুরলী শুনিল সেহ
কান্ধের আঁচল পড়ি যায়।
কুমার করিয়া কোলে কেহ গীত গায় স্বরে
বংশীনাদে পুত্র ফেলি ধায়॥
কেহ ছিল গৃহকর্ম্মে মুরলী শুনিয়া মর্ম্মে
চলে সে দুকূল পরিহরি।
মুরলী শুনিয়া কানে গোপীগণ যায় বনে
কেহ কারে সম্ভাষ না করি॥
এমন কহিব কত রাধা আদি শত শত
গোপ-গোপী যতেক আছিল।
শুনি বংশী সুললিত সবার মোহিত চিত
সবে শ্যাম সম্ভাষে চলিল॥"

উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে দেখা যাইতেছে যে মূলের সহিত শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের একটা বেশ মোটামুটী ঐক্য থাকিলেও গোবিন্দ মঙ্গলের কবি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবির ভাব ও ভাষাকে ঘষিয়া মাজিয়া অধিকতর সুন্দর করিয়াছেন। দোমেটে মূর্ত্তিতে রং ফিরাইলে যেরূপ দেখায় মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের পর দুঃখীশ্যামের গোবিন্দ মঙ্গলও সেই-রূপ দেখাইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে ইহার নামোল্লেখ নাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস দীনেশ বাবু এ গ্রন্থখানির বিষয় অবগত ছিলেন না বলিয়াই ইহার নামোল্লেখ করিতে পারেন নাই। কারণ তিনি শ্রীকৃষ্ণবিজয় ব্যতীত আরও যে আট দশখানি ভাগবতের অনুবাদের উল্লেখ করিয়াছেন এবং ঐসকল গ্রন্থ হইতে যে দু'একটী অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন, উহাদের সহিত তুলনায় আমাদের এই কবি ও তাঁহার কাব্যের স্থান যে অনেক উচ্চে হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

দুঃখীশ্যাম ভিন্ন লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস, রঘুনাথ পণ্ডিত, কবিচন্দ্র প্রভৃতি যে কয়েক ব্যক্তি ভাগবতার্থ সঙ্কলন পূর্ব্বক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই সম্পূর্ণ কৃষ্ণ-চরিত প্রকাশ করেন নাই। কেহ রাস, কেহ প্রভাস, কেহ বা কেবল গোকুল-বৃত্তান্ত বা দ্বারকা-লীলা বর্ণন করিয়াছেন। গোবিন্দ-মঙ্গল গ্রন্থে সমস্ত কৃষ্ণ-চরিত আছে। এই কারণে সংকীর্ত্তন-প্রিয় বৈষ্ণবদিগের মধ্যে গোবিন্দ-মঙ্গল গীত সহজেই পরিগৃহীত ও প্রচারিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ দ্বারাই দুঃখীশ্যামের যশ বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং তিনি পরম জ্ঞানী, প্রগাঢ় প্রেমিক ও ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হ'ন।

দুঃখী শ্যাম গোবিন্দ মঙ্গলের প্রথমে বিষ্ণু বন্দনা ও পরে সর্ব্বদেব বন্দনা করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। গোবিন্দ-মঙ্গল ভক্তি গ্রন্থ; কাব্য গ্রন্থ নহে। তথাপি ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ মনোহর বিচিত্র লীলা-বিলাসের অপূর্ব্ব বর্ণনা থাকাতে ইহা সর্ব্বরস ও সর্ব্বালঙ্কার যুক্ত মহার্হ কাব্য পদবীতে অধিরূঢ় হইয়াছে। গোবিন্দ-মঙ্গলের বর্ণনা যেরূপ প্রাঞ্জল, কবিত্বও সেইরূপ মধুর। দুঃখী শ্যাম করুণ রস বর্ণনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ ছাড়িয়া গিয়া মথুরায় রাজা হইয়াছেন; বহুদিন পরে ব্রজের কথা, নন্দ যশোদার কথা, আর বিরহিণী শ্রীরাধিকার কথা, তাঁহার মনে পড়িয়াছে; তিনি ব্রজের সংবাদ লইবার জন্য উদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইয়াছেন,—বিরহ বিশীর্ণা রাধিকা কাঁদিয়া কাঁদিয়া উদ্ধবকে বলিতেছেন:—

"পৌষের প্রবল শীতে পবন প্রবলে।
পাতিয়া পঙ্কজ পত্র শুতি মহীতলে॥
প্রভুর পিরীতি প্রেম মনে মনে গণি।
প্রতি বোলে পুড়ে মোরে পাপ ননদিনী॥
উদ্ধব! প্রিয়া গুণনিধি।
পাইনু পরশ মণি বিড়ম্বিল বিধি॥
মাঘেতে মাধব সঙ্গে এ মণি মন্দিরে।
মহারঙ্গে রমিব মানস নিরন্তরে॥

মাধবী মল্লিকা লতা কুঞ্জের ভিতরে।
মনে না জানিল হরি যাবে মধুপুরে॥
উদ্ধব! মরি হে ঝুরিয়া।
মনে করি মরিব মাধব স্মরিয়া॥

ফাল্গুনে ফুটিল ফুল দক্ষিণ পবনে।
ফাগু খেলে নন্দলাল প্রফুল্ল কাননে॥
ফুলের দোলায় দোলে শ্যাম নটরায়।
ফাগু মারে গোপিনী মঙ্গল গীত গায়॥
উদ্ধব! ফাটিয়া যায় হিয়া।
ফুকারি ফুকারি কান্দি শ্যাম স্মঙরিয়া॥

চৈত্রেতে চাতক পক্ষী ডাকে মন্দ মধু।
সচেতন না রহে অঙ্গ না দেখিয়া বঁধু॥
চিত্ত নিবারিব কত বিরহ ব্যথায়।
চিতা যেন দহে দেহ বসন্তের বায়॥
উদ্ধব! চিত্ত চল চল করে।
চঞ্চল চড়ুই যেন পড়িয়া পিঞ্জরে॥

বৈশাখে বিষের বাণে মলয়ের বায়।
বিরহী বিকল করে কোকিলের রায়॥
বাসা ভাঙ্গি নন্দকী করিব তোরে দুর।
বন্ধুরে আনিয়া দেহ গিয়া মধুপুর॥
উদ্ধব হে! বিস্মরণ নয়।
বুকেতে বিষের শেল বাহির না হয়॥

শ্রাবণে সরস রস বরষা বিপুলে।
সরসিজ বিকশিত ষট্‌পদ হিল্লোলে॥
সুখ বৈভব সব গেল শ্যাম সঙ্গে।
সঙরি সঙরি কান্দি এ ভব তরঙ্গে॥"

এই বারমাস্যা বর্ণনাটি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের একটী বিশেষ লক্ষণ। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের বিষয় আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার কতকগুলি বাঁধা বিষয় ছিল; বঙ্গীয় কবিগণ সেই নির্দ্ধারিত বিষয়-গুলি লইয়া তাঁহাদের প্রতিভার খেলা দেখাইয়াছেন। উদ্ধব 'বারমাসী' বা এই বারমাস্যা বর্ণনাটীও এই পর্য্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত। বঙ্গদেশ ষড় ঋতুর প্রিয়-লীলাক্ষেত্র; বারমাসের বারটী রূপ এখানে প্রকৃতির পটে পরিষ্কার রূপে অঙ্কিত হওয়ায় বঙ্গীয় কবিগণ বৎসরের বারখানি সুখ দুঃখের চিত্র এত সুন্দর রূপে দেখাইতে পারিয়াছেন। মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে ফুল্লরা ও খুল্লনার বারমাস্যা, বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণের পদ্মবতীর বারমাস্যা, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ প্রভৃতির বিদ্যাসুন্দর গুলিতে বিদ্যার বারমাস্যা, সৈয়দ আলো-য়াল কবির নাগমতীর বারমাস্যা প্রভৃতি সকল বারমাস্যা গুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দুঃখী শ্যামের এই বারমাস্যাটিও তাহার সুন্দর এবং নিপুণ তুলিকার উপযুক্ত।

প্রচীন সাহিত্যের আর একটী সম্পত্তি "চৌতিসা" বা চৌত্রিশটী অক্ষর লইয়া কবিতা। প্রাচীন কবির গ্রন্থমাত্রেই একটী না একটী 'চৌতিশা' আছেই। এই চৌতিশা শুধু শব্দ লইয়া খেলা; উহার সহিত ভাবের কোন বিশেষ সম্বন্ধ না থাকিলেও এই শব্দ লইয়া খেলার মধ্যে ভাষা সাজাইবার একটা বিশেষ চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। গোবিন্দ-মঙ্গলের কবিও তাঁহার গ্রন্থে ইহার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার "উদ্ধব চৌতিশায়" বাক্যকলা ও লিপি চাতুরীর বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা:—

"মাধব মহিমা নিধি মহাসুখ নিরবধি
মরকত জিনি শ্যামতনু।
মণি মণ্ডপের মাঝে মণিময় রত্ন সাজে
মধ্যে সিংহাসনে রাধা কানু॥
মণ্ডলী মণ্ডল অতি মধুর মঙ্গল গীতি
মৃদঙ্গ মুরজ সখী ধরে।

মন্দ মন্দ সমীরণ মুকুলিত তরুগণ
মত্ত ময়ূরী নৃত্য করে ॥"

"রঙ্গিম অধর শ্যাম রাঙ্গা আঁখি অনুপম
রঙ্গিম বসন কটি মাঝে।
রসনা কিঙ্কিণী সাজে রতন মঞ্জীর রাজে
রাঙ্গা পায় রুণু ঝুণু বাজে ॥
রমণী রতন রঙ্গে রাস রস শ্যাম সঙ্গে
রসময় তরুলতাগণ।
রঙ্গে অঙ্গে অঙ্গ হেলি রহে প্রভু বনমালী
রঙ্গিয়া নাগর নারায়ণ ॥"

গোবিন্দ-মঙ্গলের দানলীলা ও নৌকাখণ্ডের পদগুলিও মসৃণ ও ললিত। স্থানাভাব বশতঃ আমরা আর তাহা হইতে কোন অংশ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

দুঃখী শ্যাম গোবিন্দ মঙ্গল ব্যতীত একখানি "একাদশী ব্রত" কথাও লিখিয়াছিলেন এবং শ্রীধর স্বামীর টীকা অবলম্বন করিয়া মূল শ্রীমদ্ভাগবত অতি সহজ ভাষায় পদ্যানুবাদ করেন। মেদিনীপুর নিবাসী আমার পিতৃব্য প্রতিম শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয়ের সম্পাদকতায় কলিকাতা বঙ্গবাসী অফিস হইতে ১ম ও ২য় স্কন্ধ ভাগবত ছাপা হইয়াছে। ঈশান বাবু কর্তৃক সম্পাদিত একখানি গোবিন্দ-মঙ্গলও আছে। এই গ্রন্থখানি বঙ্গীয় পাঠক-গণের নিকট এরূপ সমাদৃত হইয়াছে যে ইতিমধ্যে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়া গিয়াছে। এই গল্প ও উপন্যাসের যুগে প্রাচীন কবির গ্রন্থের এরূপ আদর প্রাচীন কবির কৃতিত্বেরই পরিচায়ক।

দুঃখী শ্যাম স্বয়ং মেদিনীপুর জেলার অনেক স্থলে তাঁহার গোবিন্দ-মঙ্গল গ্রন্থ গান করিয়া বেড়াইতেন। ফলে তিনি বহু সম্ভ্রান্ত জমিদারের অনুগ্রহ ভাজন হইয়াছিলেন। ঐ সকল জমীদারের নিকট হইতে তিনি কিছু কিছু নিষ্কর ভূমিও বৃত্তি স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ

কবিগণের মৃত্যুর পরেই যাঁহাদের যশঃ কীর্ত্তি বিস্তারিত হয় ; কিন্তু দুঃখী শ্যামের জীবনকালেই তাঁহার যশ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

কথিত আছে ভক্ত দুঃখী শ্যাম গোবিন্দ-মঙ্গল গ্রন্থখানিকে প্রতিদিন পুষ্পচন্দনে পূজা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে সেই গ্রন্থখানি তদীয় বংশে ইষ্টপূজার "যন্ত্র" বা মন্ত্রেশ্বর রূপে নিত্য পূজা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। দশশালা বন্দোবস্তের সময় দুঃখী শ্যামের বংশীয় গোবিন্দ অধিকারীকে যে সনন্দ দেওয়া হয়, সেই সনন্দে দুঃখী শ্যামের প্রাপ্ত ভূমি সকলকে দেবোত্তর করিয়া দেওয়া হয়। সেই সনন্দে উদ্দিষ্ট দেবতার কোন নামকরণ হয় নাই। "শ্রীশ্রী৺ সেবার কারণ" এইমাত্র লিখিত আছে। পরে জমিদারী সেরেস্তায় ঐ দেবতার নাম "গোবিন্দজী" উল্লিখিত হয়। গোবিন্দজী নামে কোন বিগ্রহ বা শিলা বা ঘট পটাদি বস্তু নাই। গোবিন্দ-মঙ্গল গ্রন্থখানিই সেই দেবতা। দুঃখী শ্যামের বংশের স্ত্রীলোকগণও তাঁহাদের নিত্যসেবিত সেই দেবতার ঠিক নাম জানেন না। তাঁহারা বলেন দুঃখী শ্যাম ঠাকুর।

গোবিন্দ মঙ্গল গ্রন্থ ঠিক কোন সময়ে লিখিত হইয়াছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। চণ্ডী-মঙ্গলাদি গ্রন্থের শেষে গ্রন্থ রচনার সময় নির্দ্দেশক যেমন এক একটী কবিতা আছে, গোবিন্দ মঙ্গলের সেরূপ কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। দুঃখী শ্যাম ভক্ত কবি ; তিনি ভক্তিরসে মগ্ন হইয়াই গোবিন্দ মঙ্গল গ্রন্থ সমাপন করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহার দিগ্‌দেশকালাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিবার অবসর ঘটিয়া উঠে নাই। হরিগুণানুকীর্ত্তনই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এইজন্য মুকুন্দরাম, কাশীরাম, রামেশ্বর, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবিগণের গ্রন্থ মধ্য হইতে আমরা যেমন তত্তৎ কবিগণের একটু সংক্ষিপ্ত জীবনী, তাঁহাদের পুত্র কন্যাদির কথা, সে সময়কার সামাজিক অবস্থার বিবরণ ও গ্রন্থাদি রচনার সময়াদি জানিতে পারি, দুঃখী শ্যামের গ্রন্থ হইতে সে সম্বন্ধে কিছু জানিবার উপায় নাই। দীনতার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি বৈষ্ণব কবিগণের এইটুকুই বিশেষত্ব। দীনতা শ্যামদাসের দুঃখী নাম সার্থক করিয়াছে।

যাঁহার অসামান্য উদার শিক্ষাপ্রভাবে এই ব্রাহ্মণ প্রধান হিন্দুর দেশে বিষ্ণুভক্ত চণ্ডালও মুনিশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন, সেই চৈতন্যদেবের

প্রসাদে কায়স্থ দুঃখী শ্যামও অনেকের মন্ত্রদাতা গুরু হইয়াছিলেন। এখনও ইঁহার বংশধরেরা ঐ সকল শিষ্য বংশের দীক্ষামন্ত্র দান ইত্যাদি গুরুকার্য্য করিয়া আসিতেছেন। এই দীক্ষাদান কার্য্য এই বংশে প্রথিত হইলে সেই কার্য্যানুবোধক "অধিকারী" বিশেষণটী একণে তাঁহাদের উপাধিতে পরিণত হইয়াছে।

দুঃখী শ্যামের রচিত কতকগুলি পদও আছে। উড়িষ্যার বৈষ্ণব গায়কদিগের মুখে প্রায়ই তাহাদের গান শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু প্রথম শুনিলে তাহাদিগকে 'অবিমিশ্র' উড়িয়া বলিয়াই মনে হয়। বঙ্গীয় কবির রচিত পদ উড়িয়া লিপিকারের প্রসাদে এইরূপ মিশ্র আকার ধারণ করিয়া থাকিবে। স্থানাভাব বশতঃ আমরা আর তাহা উদ্ধৃত করিলাম না।

শ্যামানন্দের অন্যান্য শিষ্যগণের মধ্যে আর কাহারও রচিত কোন গ্রন্থের অথবা পদের সন্ধান পাওয়া যায় নাই; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা যে কোন গ্রন্থ বা পদাদি রচনা করিয়া যান নাই, এমন মনে করিবার কোন কারণও নাই। বৈষ্ণবযুগের সেই পূর্ণ বসন্তে যখন সকল কোকিলের কণ্ঠ হইতেই ঝঙ্কার উঠিয়াছিল, তখন ইঁহারাও যে নীরব ছিলেন তাহা সম্ভব নহে। পূর্ব্বকালে প্রায় প্রত্যেক বৈষ্ণবই পদ রচনা করিতেন; সুতরাং তাঁহারা সকলে পদকর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ না করিলেও পদকর্ত্তা ছিলেন বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন—"এই বিরাট অধ্যবসায় চিহ্নিত কীর্ত্তির প্রান্তে দাঁড়াইয়া আমাদিগকে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। বটতলার কর্ম্মঠতা ও উদ্যম এই সাহিত্যের অতি নগণ্য অংশ এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। কীট, অগ্নি ও তাচ্ছিল্যের হস্তে বৎসর বৎসর এই প্রাচীন কীর্ত্তিরাশি লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার উপযুক্ত কোন আয়োজনই এখন পর্য্যন্তও হয় নাই।" হয়ত মেদিনীপুরের কোন নিভৃত পল্লীর দরিদ্র কৃষকের কুটীরে জরাজীর্ণ কীটদষ্ট স্তূপীকৃত কাগজরাশি বা তালপত্রের মধ্যে সে রত্নরাজি এখনও ক্ষীণদেহে লুক্কায়িত রহিয়াছে; কিন্তু কে তাঁহার খোঁজ লয়?

পদাবলী সাহিত্য।

বৈষ্ণবযুগ বঙ্গ-সাহিত্যের পূর্ণ বসন্তকাল। বৈষ্ণব কবিগণই এই বসন্তের কলকণ্ঠ কোকিল। আর এই কোমল মধুর ভাব-রস-পীযূষ-সিক্ত পদাবলীই তাঁহাদের কাকলী। একদিন তাঁহাদের সেই কুহুতানে, সেই পঞ্চমের ঝঙ্কারে যে সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল, এখনও বাঙ্গালীর মরমে মরমে সেই ধ্বনিই প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বর্ত্তমান যুগে বঙ্গের কয়েকজন খ্যাতনামা কবির কাব্যে এখনও আমরা তাহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইতেছি। বৈষ্ণব কবিগণ প্রেমের কবি ছিলেন; তাঁহারা প্রফুল্ল কণ্ঠে প্রেম-সঙ্গীত গাহিতে বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—সাহিত্যের পুষ্টিসাধন তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহারা বাঙ্গালী ছিলেন, তাই বাঙ্গালা ভাষায় গান গাহিয়া হৃদয়ের অতৃপ্ত প্রেম কাহিনী ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রেমময় লেখনী নিঃসৃত যে অমূল্য রত্নরাজি সাহিত্য-ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়া ইহার কলেবর শ্রীসম্পন্ন করিয়াছে, তাহা তাঁহাদের অজ্ঞাতসারেই সংঘটিত হইয়াছে। সাহিত্য উন্নত করিবার কল্পনা কোন দিনই তাঁহাদের মনে উদিত হয় নাই। তাঁহারা নিজের মনে নিজের প্রাণে বিপুল উল্লাস সহকারে মরমের নিভৃত প্রান্ত হইতে যে প্রেম সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন, তাহাই দৈবক্রমে বঙ্গভাষার, মাতৃভাষার অলঙ্কার স্বরূপ হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কত শত কবি-কোকিল বঙ্গীয় কবিতা-কানন মুখরিত ও অলঙ্কৃত করিয়াছেন।

বৈষ্ণব কবিগণ ভাষার দিকে আদৌ লক্ষ্য করেন নাই, কিন্তু ভাষা চিরাশ্রিতা দাসীর ন্যায় তাঁহাদের ভাবের অনুসরণ করিয়া যে সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়া গিয়াছে এবং সেই সাহিত্যে যে স্বভাবসুন্দর চিত্র সুনিপুণ চিত্রকরের তুলিকা নিঃসৃতের ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত হইয়া আছে, সেরূপ পরবর্ত্তী যুগের অন্য কোন কবিই চিত্রিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। একজন খ্যাতনামা বঙ্গীয় সাহিত্যসেবী লিখিয়াছেন—"শাক্ত ও বৈষ্ণব, হিন্দুদিগের এই দুই সম্প্রদায়ই প্রধান এবং এই দুই সম্প্রদায়ের নিকটে বঙ্গভাষা সমধিক ঋণী। শাক্তদিগের কল্যাণে বঙ্গভাষা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিলেও বৈষ্ণবদিগের প্রসাদে উহা শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে। বৈষ্ণবগণ বাঙ্গালা পদ্যে যে সরলতা, যে মধুরতা প্রদান করিয়াছেন, শাক্তগণ তাহা দিতে

পারেন নাই। তাহার কারণ বৈষ্ণবগণ সৌন্দর্য্যের উপাসক, শাক্তগণ ভীম কান্তির উপাসক। বৈষ্ণব গ্রন্থের তুলনায় শাক্তগ্রন্থ নগণ্য।"

বৈষ্ণবগণ যে সমুদয় পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলে প্রাণ আকুল করে। আমরা যে কয়েকটী পদ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি, সেগুলি এই যুগের শ্রেষ্ঠ রত্ন বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাস অথবা জ্ঞান দাস বা গোবিন্দ দাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তাগণের রচিত পদাবলীর বহু নিম্নে স্থান পাইলেও উহাদের কবিত্বও মনোহারী, প্রাণস্পর্শী; উহাদের অঙ্গেও একটা মাধুর্য্য ও মাদকতা মাখান আছে; উহারাও 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া মনপ্রাণ আকুল করে।' মেদিনীপুরের বঙ্গ-সাহিত্যের প্রথমাবস্থা এই অধ্যায়েরই অন্তর্গত, সুতরাং এই যুগের সাহিত্যের আলোচনা মেদিনীপুরবাসীমাত্রেরই আলোচ্য। শৈশবের বিলুপ্তপ্রায় স্মৃতিজাল ভেদ করিলে যেমন স্নেহময়ী জননীর অপূর্ব্ব বাৎসল্যের প্রথম বিকাশ হৃদয়-দর্পণে প্রতিফলিত হয়, তেমনি মেদিনীপুরে বঙ্গসাহিত্যের প্রথমাবস্থায় আমরা পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণব কবিগণের সেই প্রতিভায় অস্পষ্ট আলোক ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই নাই। উহা অস্পষ্ট হউক, ক্ষীণ হউক, তথাপি উহা আলোক; এবং উহাই আমাদের মেদিনীপুরের অতীত ইতিহাসের দুর্নিরীক্ষ্য ও অচিহ্নিত রাজ্যের একমাত্র পথপ্রদর্শক আলোকস্তম্ভ।

পদাবলী সাহিত্য বঙ্গের অমূল্য সম্পত্তি। উহা বাঙ্গালীর নিকট কোহিনুর, কৌস্তুভ ও পারিজাত অপেক্ষাও মূল্যবান্। কোহিনুর, কৌস্তুভ,—ভাঙ্গে; পারিজাত ম্লান হয়, সে সব রত্ন লুণ্ঠন যোগ্য; কিন্তু ইহা অক্ষয়, অবিনশ্বর; লুণ্ঠনে ইহার গৌরব বৃদ্ধি হয়। ইহার মধ্যে একাধারে ভ্রমরের গুঞ্জন, বীণার নিক্বণ, কুসুমের গন্ধ ও প্রকৃতির শোভা আছে। দীনেশ বাবুর কথায় আমরাও বলি— "এই গীতিকবিতাগুলি আমরা ইংলণ্ডের ও আমেরিকার সাহিত্য-প্রদর্শনীতে লইয়া দেখাইতে পারি; আত্মগরিমায় রাজ্যের অধিবাসীবৃন্দকে আত্মবিসর্জ্জনের কথা শুনাইয়া মুগ্ধ করিতে পারি।"

সংস্কার যুগ

বৈষ্ণব যুগের পর বঙ্গসাহিত্যের যে যুগ আসিয়াছিল দীনেশ বাবু তাহাকে "সংস্কার যুগ" আখ্যা দিয়াছেন। প্রেমাবতার চৈতন্যদেবের ভগবৎ প্রেমের প্রবল বন্যায় যে সময় বঙ্গভাষার নিরুদ্ধস্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া বৈষ্ণব কবিগণের কীর্ত্তিকাহিনী সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছিল—বঙ্গদেশের সেই স্মরণীয় যুগে—বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবল তাড়নে—কতকগুলি লৌকিক দেবতার পূজা পদ্ধতি লুপ্ত প্রায় হইয়া যায় এবং তত্তৎ দেবতার মহিমা ব্যঞ্জক লৌকিক সাহিত্য বিস্মৃতির তিমিরগর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু প্রাচীন তত্ত্ব হওয়ার জিনিষ নহে; যুগে যুগে প্রতিভান্বিত পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া পুরাতন ভাঙ্গিয়া নূতনের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান বটে, কিন্তু প্রতিভাবান্ ব্যক্তি অন্তর্হিত হইলে আবার প্রাচীন আসিয়া স্বীয় আধিপত্য সুস্থির করে। নূতন ও পুরাতন কালের দ্বন্দ্ব ভাবি সমাজ গঠিত হয়। বৈষ্ণব যুগের অবসানে লোকের আবার সেই সকল প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই যুগে প্রাচীন রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডীর গান, মনসার ভাসান প্রভৃতি সমস্ত পুস্তকই নবভাবে সংস্কৃত হইয়া প্রকাশিত হয়। এই নূতন সংস্করণময় যুগের নামই "সংস্কার যুগ।" আমরা এক্ষণে এই সংস্কার যুগের বঙ্গসাহিত্যের সহিত মেদিনীপুরের সম্বন্ধ কতটুকু তাহার আলোচনা করিব।

সংস্কার যুগের তিনটী প্রধান পুরুষ,—কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, কাশীরাম দাস, আর রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য। মেদিনীপুরের বড়ই সৌভাগ্য যে এই তিন জনের সহিতই তাহার একটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য এই মেদিনীপুর জেলারই অধিবাসী; কিন্তু মুকুন্দরাম ও কাশীরাম মেদিনীপুরের অধিবাসী না হইলেও আজ যে জন্য তাঁহাদের এত গৌরব তাহার ষোল আনা অংশই মেদিনীপুরের প্রাপ্য।

কবিকঙ্কন মকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত রায়না থানার অধীন দামুন্তা গ্রামে কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতামহের নাম জগন্নাথ মিশ্র, পিতার নাম হৃদয় মিশ্র, মাতার নাম দৈবকী। দরিদ্র কবি সাত পুরুষ যাবত চাষা-বাদ করিয়া সেই ক্ষুদ্র দামুন্তা পল্লীতেই বাস করিতেছিলেন। কিন্তু বঙ্গদেশের রাজনৈতিক বিপ্লব দূরপল্লীর সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণকেও একদিন গৃহ সুখে বঞ্চিত করিল। মামুদ সরিফ নামক এক মুসলমান ডিহিদারের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া মুকুন্দরাম সপরিবারে জন্মভূমি দামুন্তা গ্রাম পরিত্যাগ করিলেন। দেশের কোথাও তাঁহার অন্ন মিলিল না। দরিদ্র ব্রাহ্মণ অর্থাভাবে অনাহারে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

"তৈল বিনা কৈলুঁ স্নান, করিলুঁ উদক পান
শিশু কাঁদে ওদনের তরে।
আশ্রম পুখুরি আড়া নৈবেদ্য শালুক নাড়া।"

পথে এমনি অসীম কষ্ট ভোগ করিয়া ব্রাহ্মণ একদিন মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঘাটাল থানার অধীন আড়রা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্রামের জমীদার রাজা বাঁকুড়া রায় তাঁহার দুঃখের কথা অবগত হইয়া তাঁহাকে "দশ আড়া মাপি দিলা ধান", আর—

"সুধন্ম বাঁকুড়া রায়, ভাঙ্গিল সকল দায়, শিশু পাছে কৈল নিয়োজিত।
তার সুত রঘুনাথ, রাজগুণে অবদাত, গুরু করি করিলা পূজিত।"

ব্রাহ্মণের অন্ন চিন্তা দূর হইল। আশ্রয় মিলিল। আড়রাগড়ের রাজবংশের অন্ন জলে পুষ্ট হইয়া মুকুন্দরাম তাঁহার মনোহর চণ্ডীকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

আড়রাগড়ের রাজবংশের বংশাবলী হইতে জানিতে পারা যায় যে, রাজা রঘুনাথ রায় ১৪৯৫ শক (১৫৭৩ খৃঃ অব্দ) হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫২৫ শক (১৬০৩ খৃঃ অঃ) পর্য্যন্ত ৩০ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছেলেন। অনুমান ইঁহারই রাজত্বকালে ১৪৯৯ শকে (১৫৭৭ খৃঃ অঃ) মুকুন্দরাম তাঁহার চণ্ডীকাব্য রচনা আরম্ভ করেন এবং ইহার ১০।১২ বৎসর পরে যখন এদেশে রাজা মান সিংহের আধিপত্য সুবিদিত হইয়াছিল, সেই সময় উঁহার রচনা শেষ করেন।

মুকুন্দরাম এই কাব্যে ভগবতীর পৃথিবীতে পূজা প্রচারার্থে কালকেতু ব্যাধের ও শ্রীমন্ত সওদাগরের দুইটী বৃহৎ উপাখ্যান সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতির অনেক উপাখ্যান, সুরলোক ও সুরগণের বিবরণ, ভারতবর্ষের নানা দেশের নদ নদী, গ্রাম, নগর, অরণ্য প্রভৃতির বর্ণন এবং পশু পক্ষী ও নানা প্রাকৃতিক নানা ধর্ম্মী, নানা জাতীয় লোকের বিভিন্ন প্রকার স্বভাবগুলি অতি সুন্দর ও মনোমুগ্ধকররূপে চিত্রিত করিয়াছেন। ওই সকল বর্ণনা পাঠ করিলে কবি যে সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ও বহুদর্শী লোক ছিলেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। যদিও কয়েকটীস্থলে তাঁহার বর্ণিত নায়ক নায়িকা প্রভৃতির কার্য্য ও ব্যবহার অত্যুক্তি দূষিত ও অনৈসর্গিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তিনি তাঁহার চরিত্রগুলি যথাযথরূপেই চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার কালকেতু, ভাঁড়ুদত্ত, ধনপতি, শ্রীমন্ত, মুরারীশীল, খুল্লনা, লহনা, ফুল্লরা, দুর্ব্বলা প্রভৃতি সমুদয় চরিত্রগুলিই তৎকালীন বঙ্গসংসারের এক একখানি জীবন্ত ছবি।

মুকুন্দরাম খাঁটি বাঙ্গালী কবি; তাই তিনি বঙ্গসংসারের খাঁটি ছবিই আঁকিয়াছেন। এই কারণে আমরা দেখিতে পাই তাঁহার পুরুষ চরিত্রগুলি মহাকবির নায়ক চরিত্রের উপযোগী উৎকৃষ্ট উপকরণে গঠিত না হইলেও তাঁহার স্ত্রীচরিত্রগুলি প্রথম শ্রেণীর কাব্যেরই উপযুক্ত চিত্র। এদেশের ইতিহাসের ঐ অধ্যায়ে রাম, লক্ষ্মণ, ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি আদর্শ পুরুষগণের শ্রেণী একবারে লুপ্ত হইয়া গেলেও সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি রমণীগণের শ্রেণী তখনও ছিল এবং এখনও কতকাংশে অবিচ্ছিন্ন রহিয়াছে। দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন "স্বামীর সঙ্গে বনগমন না করিলেও সেদিন পর্য্যন্ত বঙ্গীয় রমণীগণ হাস্যমুখে স্বামীর শ্মশানে পত্নীর স্থান জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিতা ফুল্লরা, খুল্লনা ও বেহুলাকে চিনিতে বিলম্ব হইলেও তাঁহারা সেই পৌরাণিক রমণীগণেরই জ্ঞাতি এবং এক বংশের লক্ষ্মণাক্রান্তা। মুকুন্দরামের চণ্ডীতে পুরুষের পৌরুষ না থাকিলেও উৎকৃষ্ট রমণীচিত্র বিরল নহে।" মুকুন্দরামের কাব্যের গৌরব এইখানে। এইখানেই কবির লিপি প্রাণ শ্রেষ্ঠত্ব।

মুকুন্দরামের আর একটী গৌরব দুঃখ বর্ণনায় কৃতিত্বে। কবি নিজে দরিদ্র ছিলেন, দারিদ্র্যের কষ্ট তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন, তাই দারিদ্র্য বর্ণন সময়ে কবিত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। ফুল্লরার বারমাস্যাটী যেরূপ সরল ও স্বাভাবিক সেইরূপ পরিস্ফুট ও ভাবের গভীরতায় পূর্ণ। উহা পাঠ করিলে হৃদয়ে একটি করুণার ছবি জাগিয়া উঠে। খুল্লনার বারমাস্যা হইতে ফুল্লরার বারমাস্যাটী হৃদয়কে গভীররূপে স্পর্শ করে। খুল্লনা ধনীর কন্যা, ধনীর স্ত্রী তাই তাঁহার বারমাস্যাটিতে তাঁহার সুখের কথাই বর্ণিত হইয়াছে। রাজকন্যা স্বামীকে সিংহলের বারমাসের সুখের চিত্রই দেখাইয়াছেন। আর অভাগী ফুল্লরা দরিদ্র ব্যাধের বনিতা; তার অঙ্গে আচ্ছাদন নাই, শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে তাহাকে মাংস বিক্রয় করিতে যাইতে হয়; তার পরণের কাপড় নাই, হরিণের ছড় পরিয়াই তাহাকে কাটাইতে হয়; 'ভেরেণ্ডার খামওয়ালা' 'তালপাতার ছাওনি' একখানা 'ভাঙ্গা কুড়ে' ঘর আছে, তাও আবার 'বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে"; পেটভরা ভাতত কোন দিন জুটে নাই, খায় আমানি, তারও একখানা 'ভাঙ্গা পাথর' নাই, গর্ত্তে ঢালিয়া খাইতে হয়। কাঙ্গালিনী চণ্ডীর পাশে বসিয়া তাহার সেই দুঃখের কাহিনীই বলিয়াছে। দুঃখিনী ফুল্লরার এই দৈনিক কষ্টসহ মূর্ত্তিখানি দেখিলে আমাদের কান্না পায়। ফুল্লরার বারমাস্যার ন্যায় খুল্লনার বারমাস্যাটীও করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী। দারিদ্র্যের করুণরস দরিদ্র কবির কাব্যে আদ্যোপান্ত প্রবাহিত।

মুকুন্দরাম চণ্ডী কাব্যে তাঁহার পরিহাস শক্তিরও যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীমন্তের নৌকায় বাঙ্গাল মাঝিগণের দুর্দ্দশায় ও হরপার্ব্বতীর কোন্দলের বর্ণনার মধ্যে স্বাভাবিক হাস্যরসের একটী সুন্দর খেলা দৃষ্ট হয়। ঐ হরপার্ব্বতীর কোন্দল উপলক্ষ করিয়া কবি একটী দরিদ্র সংসারের চিত্র আমাদিগের সম্মুখে ধরিলেও অন্নপূর্ণার ঘরে অন্নের ঐরূপ অভাব দেখিয়া আমরা হাস্য না করিয়াও থাকিতে পারি না। ভাঁড়ুদত্ত ও মুরারীশীল বণিকের বঞ্চকতা বর্ণনে ও ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে সমাজে আত্ম সম্মান পাইবার জন্য বণিকদিগের বাধিকতা প্রভৃতির বর্ণনাস্থলে কবির লোক ব্যবহারভিজ্ঞতারও পর্য্যাপ্ত প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে।

মুকুন্দরাম বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বপ্রধান কবি; তিনি তাঁহার কাব্যে সমাজের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে স্থান পাইলেও তিনি কিন্তু নিজে কবিত্ব, পাণ্ডিত্য ও কল্পনাংশে প্রাচীন কবিগণের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া লইয়াছেন। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, "অন্যের কথা দূরে থাকুক, কবিত্ববিষয়ে ভারতচন্দ্রের যে এত গৌরব এবং আমাদেরও যে ভারতচন্দ্রের প্রতি এত শ্রদ্ধা আছে কিন্তু চণ্ডী পাঠের পর অন্নদামঙ্গল পাঠ করিলে, সে গৌরব ও সে শ্রদ্ধার হ্রাস হইয়া যায়। সংস্কৃতে যেমন মাঘকবি ভারবীর কিরাতার্জ্জুনীয়কে আদর্শ করিয়া শিশুপাল বধের রচনা করিয়াছিলেন, ভারতচন্দ্রও সেইরূপ কবিকঙ্কণের চণ্ডীকে আদর্শ করিয়া অন্নদামঙ্গলের রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে উভয়েরই সৃষ্টি প্রক্রিয়া, দক্ষযজ্ঞ, পার্ব্বতীর জন্ম, তপস্যা, বিবাহ, হরগৌরী কোন্দল প্রভৃতি প্রায় একরূপ ধরণেই লিখিত। তদ্ভিন্ন শাপভ্রষ্ট মায়ক নায়িকার জন্ম পরিগ্রহ, ভগবতীর বৃদ্ধাবেশধারণ, মশানে পিশাচ সেনার সহিত রাজসেনার যুদ্ধ, চৌত্রিশ অক্ষরে স্তব, ঝড় বৃষ্টি দ্বারা দেশবিপ্লাবন, শঙ্খ.স্রব সহকারে ভগবতীর আত্ম পরিচয় দান, দেশ গমনোৎসুক পতির নিকট পত্নীর বারমাস্যা বর্ণন, সুপুরুষ দর্শনে কামিনী-দিগের নিজ নিজ পতিনিন্দা, দাসীর হাটকরার পরিচয় দেওয়া ইত্যাদি ভূরি ভূরি বিষয় এবং ভঙ্গ পয়ার, ঝাঁপতাল, একাবলী প্রভৃতি ছন্দ সকল ভারতচন্দ্র যে চণ্ডী হইতেই সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা ঐ দুই গ্রন্থের পাঠ মাত্রেই বুঝিতে পারা যায়। তদ্ভিন্ন ভারতচন্দ্র মধ্যে মধ্যে আদি রসের যেরূপ নিরবগুণ্ঠন বর্ণনা করিয়াছেন, কবিকঙ্কণ সেরূপ করেন নাই। তিনি অসাধারণ পরিহাসরসিক হইয়াও তদ্বর্ণনে বিশেষ বিজ্ঞতার সহিত লেখনী চালনা করিয়াছেন।"

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও তাঁহার "Literature of Bengal." নামক গ্রন্থে ওই কথাই লিখিয়াছেন:—"..... Bharat is a close imitator of Mukunda Ram ..... In character painting however, Bharatchandra can not [be compared with the great master whom he has imitated. ..... And in all the

higher qualifications of a poet, in truth, in imagination, and even in true tenderness and pathos, such as we meet with in almost every other Bengalee poet, Bharatchandra in singularly and sadly wanting." স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহোদয় তাঁহার "সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা" নামক পুস্তকে এবং শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

"ভিক্টোরিয়া যুগে বাঙ্গালা-সাহিত্য" নামক গ্রন্থলেখক রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় কিন্তু মুকুন্দরাম অপেক্ষা ভারতচন্দ্রকে বড় বলিয়া প্রমাণ করিতে গিয়া যেন নিজেই নিজেকে ব্যক্ত করিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয়। কবিত্ব, পাণ্ডিত্য ও কল্পনা গুণে ভারতচন্দ্রকে মুকুন্দরাম অপেক্ষা বড় বলাত দূরের কথা, আমরা তাঁহাকে মুকুন্দরামের তুল্যকক্ষ বলিতেও ইচ্ছুক নহি। ভারতচন্দ্রের যদি কিছু নিজস্ব থাকে, তাহা কেবল তাঁহার কথার লালিত্য ও শব্দের মাধুর্য্য। তদ্ভিন্ন প্রায় সকল বিষয়েই তিনি মুকুন্দরামের নিকট ঋণী। কিন্তু মুকুন্দরাম যে উচ্চ আদর্শ ও ভাবপ্রবণ বিশাল হৃদয় লইয়া তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, ভারতচন্দ্র তাহার গ্রন্থে সে উচ্চভাব ও বিমল রুচির পরিচয় দিতে পারেন নাই। স্বীকার করি তিনি উৎকৃষ্ট 'শব্দ কবি' ও 'ভাষা কবিতার ও শব্দ চিত্রের সুনিপুণ 'চিত্রকর'; কিন্তু তিনি যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা ভদ্রসমাজে বাহির করিবার জিনিস নহে। তাঁহার "বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি কাব্য নৈতিক জীবনের ভগ্ন পতাকা, বিজাতীয় আদর্শ ও কুরুচি কলুষিত; কাচের মূল্যে বিকাইবার যোগ্য।" ভারতচন্দ্রের কাব্যের কোন স্থানেই ভাবের পবিত্রতা বা হৃদয়ের ব্যাকুলতা নাই। তিনি কেবল অশ্লীলতা ও লিপিচাতুর্য্যেরই পরিচয় দিবার জন্য তাঁহার লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের মনে হয়। তিনি অন্নদামঙ্গলরূপ ধর্ম্ম-মণ্ডপে বাইনাচ দেখাইয়াছেন এবং বিদ্যাসুন্দর কাব্যে কুটনী দাসী সংযোগ, গৃহস্থের বাটীতে সিঁদকাটা, বাড়ীর কর্ত্তাকে বশীকরণ ইত্যাদি অশ্লীলতার সকল প্রকার বীভৎস চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন। এই সকল কারণে বিদ্যাসুন্দর কাব্যকে যেরূপ সৎসাহিত্যের মধ্যে স্থান দেওয়া হয় নাই, সেইরূপ উহার রচয়িতাকেও আমরা ভদ্রসমাজের মধ্যে স্থানদান করিতে ইচ্ছুক নহি।

স্বনামখ্যাত প্রবীণ লেখক ও শক্তিশালী সমালোচক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় "বঙ্গদর্শনে" ভারতচন্দ্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে যে কথা লিখিয়াছিলেন আমরাও আজ সেই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতেছি :—

"আমরা রায় ভারতচন্দ্রকে, তাঁহার স্রষ্টা মালি[illegible] বলিয়া বিবেচনা করি। কবি ভারত ও হীরামালিনী এক। বিদ্যা[illegible]কর্ত্রী ও বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়নকর্ত্তা এক। একণে মালিনীর স্বভাবের সহিত এই কাব্যের ভাবের তুলনা করুন। ………প্রথমতঃ কাব্যভাব দেখুন। হীরার সেই মাজা দোলা, আর ভারতের নাচনি ছন্দ। হীরার সেই সুচিক্কণ পরিষ্কৃত বস্ত্র; আর কাব্যের সেই মার্জ্জিত স্বভাব। হীরার সেই মুচকে মধুর হাস আর ভারতের সেই সহজ প্রসাদ গুণ। হীরাও হাসে, ভারতের কবিতাও হাসে। ……এমন কদর্য্য স্বভাবান্বিত কবিও বঙ্গদেশে সমূহ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। কেন? মালিনীর যে সকল গুণ থাকাতে চেংড়া মহলে তাহার পসার ছিল। ভারত সেই সকল গুণেই বঙ্গীয় চেংড়া মহলে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন। এখনও ভারত সমাদরে কিঞ্চিৎ থাকুন, তাহাতেও আপত্তি নাই এবং ভারত ও তাঁহার মালিনী এখনও চেংড়া ভুলাইয়া খাইতে থাকুন, তাহাতেও আপত্তি নাই। কিন্তু যে যুবক মালিনীর পাড়া বাগা লইয়া থাকে, তাহার দিকে সকলের একটু দৃষ্টি থাকিলে ভাল হয়; আর যে সকল বঙ্গীয় মহাজন ভারতকে মালিনীস্বভাবাপন্ন কবির যোগ্য আদর অপেক্ষা অধিক গৌরব প্রদান করিতে চান। তাঁহাদের দিকেও সকলের একটু দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।"

রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয়ের উপর আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে, তিনি একজন প্রবীণ লেখক, ভক্ত কবিও বটেন; সুতরাং তাঁহার দিকে কাহারও দৃষ্টি রাখিবার আবশ্যক না হইলেও তিনি মুকুন্দরাম অপেক্ষা ভারতচন্দ্রকে বড় করিতে গিয়া প্রাতঃস্মরণীয় রাজনারায়ণ বাবু, স্বর্গীয় রমেশ বাবু, অক্ষয় বাবু ও দীনেশ বাবু প্রভৃতি মুকুন্দরামের প্রশংসাকারি ব্যক্তিগণকে যে ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন আমরা কিছুতেই তাহার সমর্থন করিতে পারি না। হইতে পারে তিনি ভারতকে বড় করিতে গিয়া যে সকল

কথার আলোচনা করিয়াছেন তাহা তাঁহার বিশ্বাস মত নিরপেক্ষ ভাবেই বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা বলিতে গেলে যে মুকুন্দরামের প্রশংসাকারিগণকে ওরূপ তীব্রভাবে আক্রমণ না করিলে চলিত না আমাদের এরূপ বোধ হয় না। রায় সাহেবের রাগটা সর্ব্বাপেক্ষা দীনেশ বাবুর উপরেই যেন কিছু বেশী বলিয়া বোধ হয়। কেবল ঐ এক স্থানে নয় গ্রন্থের সর্ব্বত্রই যেখানে তিনি দীনেশ বাবুর নাম করিয়াছেন সেই খানেই তিনি অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া দীনেশ বাবুর উপর 'পুষ্প চন্দন বৃষ্টি করিয়াছেন।' যদিও তিনি অনুগ্রহ করিয়া গ্রন্থশেষে দীনেশ বাবুকে একখানা সার্টিফিকেট দিয়াছেন কিন্তু তাহার মধ্যেও দুইটা 'কিন্তু' আছে। তা থাকুক, দীনেশ বাবুর তাতে বড় কিছু যায় আসে না। তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অমূল্য সম্পত্তি।

পরলোকগত কাউয়েল সাহেব কবিকঙ্কন চণ্ডীর বড়ই ভক্ত ছিলেন। তিনি ইহার কোন কোন অংশ ইংরাজীতে অনুবাদও করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"In fact, Bengal was to our poet what Scotland was to Sir Walter Scott; he drew a direct inspiration from the village-life which he so loved to remember." রমেশ বাবু তাঁহার "Literature of Bengal" নামক গ্রন্থে মুকুন্দরামকে ইংরাজ কবি 'চসারের' সহিত তুলনা করিয়াছেন।

চণ্ডীকাব্য মুকুন্দরামের রত্ন জড়িত রচনা। যতদিন বঙ্গসাহিত্য থাকিবে ততদিন এই কাব্যখানি তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। আর সেই সঙ্গে তাঁহার আশ্রয়দাতা মেদিনীপুর নিবাসী রঘুনাথ রায়ের নামও অলুপ্ত থাকিবে। মুকুন্দরাম বর্দ্ধমানের দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান কিন্তু মেদিনীপুরের "কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম।"

——:o:——

বলরাম কবিকঙ্কন।

মুকুন্দরাম তাঁহার আশ্রয়দাতা বলিয়া একদিকে যেমন মেদিনীপুর জেলা নিবাসী বাঁকুড়া রায় ও তাঁহার পুত্র রঘুনাথ রায়ের নিকট ঋণী; তেমনই আবার অন্যদিকে তাঁহার কাব্যের বিষয় নির্ব্বাচনের জন্যও মেদিনীপুর নিবাসী অন্য একজন ব্যক্তির নিকট বিশেষভাবে ঋণী। তাঁহার নাম বলরাম কবিকঙ্কন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই মুকুন্দরাম গ্রন্থারম্ভে বন্দনায় লিখিয়াছেন :—

"গীতের গুরু বন্দিলাম শ্রীকবিকঙ্কন"

কেহ কেহ মনে করেন যে বলরাম কবিকঙ্কনই মুকুন্দরামের শিক্ষাগুরু। কিন্তু "গীতের গুরু" উল্লেখ থাকায় মনে হয় যে তাঁহারই গান মুকুন্দরামের আদর্শ হইয়াছিল। বলরামের চণ্ডী তৎকালে মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। মুকুন্দরাম সেই কাব্যখানির ছায়া অবলম্বনেই তাঁহার চণ্ডীকাব্য রচনা করেন।

বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত হইতে আমরা জানিতে পারি যে চারিশত বর্ষের পূর্ব্বেও "মঙ্গল চণ্ডীর জাগরণ" হিন্দুসমাজে বিশেষ প্রচলিত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় পরবর্ত্তী প্রথিতনামা কবিগণের জাগরণ প্রচলিত ও সর্ব্বত্র আদৃত হইলে সেই সুপ্রাচীন জাগরণগুলি অপ্রচলিত বা বিলুপ্ত হইয়া যায়। মুকুন্দরামের পূর্ব্বে যে কয়জন কবি চণ্ডীর উপাখ্যান লইয়া কাব্য রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন তন্মধ্যে দ্বিজ জনার্দ্দন ও বলরাম কবিকঙ্কনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

দ্বিজ জনার্দ্দন ও বলরাম কবিকঙ্কনের চণ্ডী একটী সামান্য ব্রত কথা মাত্র ছিল। পরবর্ত্তী কবিগণ সেই চিত্রগুলি অবলম্বন করিয়াই নূতন কাব্য রচনা করিয়াছেন। মুকুন্দরাম তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের কীর্ত্তি নবভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া একাই তাঁহাদিগের যশের সমস্ত অংশ অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন "মূল বিষয়ের ত কথাই নাই; অনেকই এক কথা; তাহা ছাড়া পংক্তি গুলি পর্য্যন্ত অপহৃত দেখা যায়। ......কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি লেখক নানাস্থান হইতে আহৃত রত্নে

উৎকৃষ্ট সমন্বয় করিয়াছেন ; পৃথিবী ক্ষমতার পূজক, এজন্য ইঁহারা অপহরণ করিয়াও লোক পূজার পুষ্পচন্দন পাইতেছেন।......শক্তিমান স্বেচ্ছাচারীর দ্বারা পাপ পুণ্যের গণ্ডী নির্দ্ধারিত হইতেছে,—কিন্তু এই সমস্ত সামাজিক উন্নতি ও অবনতির মূলে ভাগ্যদেবী দাঁড়াইয়া পাগলিনীর মত কাহারও মাথায় ছত্র ধরিতেছেন, কাহারও মাথার ছত্র কাড়িয়া লইতেছেন।" মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য একেইত অমিত প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়া বলরামের চণ্ডীর স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, এক্ষণে মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবে আবার নবশক্তি লাভ করিয়া জরাজীর্ণ বলরামকে একবারে দেশান্তরিত করিয়া দিয়াছে।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য নামক গ্রন্থে শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন যে বলরাম রচিত চণ্ডী তিনি দেখেন নাই ; কিন্তু মাধবাচার্য্যের চণ্ডী মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরামের চণ্ডী পাঠ করিয়া মনে হয় যেন প্রকৃতি সুন্দরী একই হস্তে দুইটী ফুল সৃষ্টি করিয়াছেন। দুইটীতেই স্বভাবতঃ অনেক সাদৃশ্য আছে, এমন কি উভয় চণ্ডীতে অনেক ছত্র পাওয়া যায়, যাহা ঠিক একরূপ। ইহা হইতে তিনি অনুমান করিয়াছেন যে হয়ত, মুকুন্দরাম সেগুলি মাধবের চণ্ডী হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, নতুবা উভয় কবিই কোন লুপ্ত কবির ভূপ্রোথিত ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার এই শেষোক্ত সিদ্ধান্তটী আমাদিগের নিকট সমধিক মূল্যবান বলিয়া মনে হয়। কারণ মাধবাচার্য্য তাঁহার কাব্যে আত্মপরিচয় সূচক যে কবিতাটী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে,—

"ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজ মাধবে গায়ে সারদা চরিত॥"

অর্থাৎ ১৫০১ শাকে, ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে মাধবাচার্য্যের চণ্ডী রচিত হয়। আর—

"শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
সেই কালে দিলা গীত হরের বনিতা॥"

অর্থাৎ ১৪৯৯ শাকে, ১৫৭৭ খৃঃ অব্দে চণ্ডী দেবী মুকুন্দরামকে পুস্তক রচনার আদেশ প্রদান করেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে মাধবের চণ্ডী লিখিত হইবার দুই বৎসর পূর্ব্বে মুকুন্দরাম তাঁহার চণ্ডী কাব্য রচনায়

প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যদিও তাঁহার ঐ কাব্যখানি লিখিতে ১০।১১ বৎসর সময় লাগিয়াছিল এবং মাধবের চণ্ডী লিখিত হইবার ৭।৮ বৎসর পরে উহার লেখা শেষ হয়; কিন্তু তাহা হইলেও এই ৭।৮ বৎসরের মধ্যে যে তাঁহার মাধবের চণ্ডী হইতে কোন সাহায্য পাইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল এরূপ বোধ হয় না। হয়ত মুকুন্দরাম ওই ৭।৮ বৎসরের মধ্যে মাধবের নাম পর্যান্তও শুনেন নাই। কারণ এখনকার ৭।৮ বৎসর আর তখনকার ৭।৮ বৎসরে অনেক প্রভেদ ছিল। এখনকার দিনে ৭।৮ বৎসরের মধ্যে এক একখানি পুস্তকের ৭।৮টি সংস্করণ বাহির হইয়া বঙ্গদেশের গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়া কিছু আশ্চর্য্যের কথা না হইতে পারে; কিন্তু একশত বৎসর পূর্ব্বে যখন এদেশে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, রেল, ষ্টীমার ছিল না, ডাক বিভাগের এরূপ সুব্যবস্থা ছিল না তখন পাঠককে কবির কাব্য লেখক দ্বারা লিখাইয়া পাঠ করিতে হইত। এইরূপে কাব্যখানির নকলের নকল গ্রামের পর গ্রাম পার হইয়া ৩।৪ বৎসরে এক একটী জেলার গণ্ডী অতিক্রম করিত। এমতাবস্থায় পূর্ব্ব বঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার সুদূর নবীনপুর পল্লী হইতে সেই কাব্যখানি পশ্চিম বঙ্গের মেদিনীপুর জেলার সেই নিভৃত পল্লী আড়রা গড়ে পৌঁছিতে যে কত সময় লাগিয়াছিল তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই কারণে মুকুন্দরাম যে তাঁহার কাব্যের উপাদান মাধবাচার্য্যের কাব্য হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা মনে হয় না। উভয় কবিই কোন লুপ্ত কবির গ্রন্থ হইতে তাঁহাদের কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন ইহাই সম্ভব। আর সেই কবিই সম্ভবতঃ এই বলরাম কবিকঙ্কন। মুকুন্দরাম সেই জন্যই ইহাকে "গীতের গুরু" বলিয়া বন্দনা করিয়া গিয়াছেন।

বলরাম রচিত সম্পূর্ণ গ্রন্থ এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহা না হইলে আমরা মুকুন্দরাম, মাধবাচার্য্য ও বলরাম এই তিন কবির তিনখানি গ্রন্থ মিলাইলে সেই প্রাচীন কীটভুক্ত কাগজের নজিরে কে মহাজন, কে খাতক তাহা চিনিতে পারিতাম এবং তাঁহাদের ঋণের পরিমাণটীও জানিতে পারিতাম। কিন্তু এখন তাহার আর উপায় নাই। তবে উৎকল কবি বলরাম কবিকঙ্কণের চণ্ডীর উৎকল ভাষায় যে অনুবাদ করিয়াছিলেন মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ অঞ্চলে এখনও তাহা প্রচলিত আছে।

দুর্গোৎসবের সময় ওই প্রদেশের অনেকের গৃহেই চণ্ডীপাঠের স্থলে ওই চণ্ডীমঙ্গল গায়কদিগের দ্বারা গীত হইয়া থাকে। আমার সোদর-প্রতিম সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ মাইতি বি-এ, মহাশয় তাঁহার বাটীস্থ চণ্ডী গায়কদিগের নিকট হইতে সেই গানগুলি আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়া যথেষ্ট অনুগৃহীত করিয়াছেন। এজন্য তাঁহার নিকট আমি একান্ত ঋণী।

বলরামের চণ্ডীর উক্ত অনুবাদটীর মধ্যে যদিও উৎকল কবি বা কবিগণের হস্ত চিহ্ন নানা স্থানে পরিশুদ্ধ রূপে অঙ্কিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় এবং বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায় যে উৎকল কবিগণ তাঁহাদের উৎকট কবিভাবের বশবর্ত্তী হইয়া উহার মধ্যে স্বীয় স্বীয় রচিত সম্পূর্ণ উৎকলীয় ভাবের নানা কবিতা ও উৎকল দেশের প্রচলিত নানাপ্রকার ক্রিয়া কলাপের সমাবেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা হইলেও আমরা উহার মধ্য হইতে বলরামের চণ্ডীর উপাখ্যানভাগটী মোটামুটী সংগ্রহ করিয়া লইতে পারি এবং অস্পষ্ট রেখার ক্ষীণ ছবি যেরূপে সম্যক বিকশিত, বড় ও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। বলরাম ও মুকুন্দরামের কাব্যও যে যথাক্রমে সেই ক্রমবিকাশের নিয়মেই সুস্পষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারি।

চৈতন্য দেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে গায়কগণ মঙ্গলচণ্ডীর ছড়া গাহিয়া রাত্রি জাগরণ করিত; কিন্তু সে গীত কিরূপ ছিল, তাহা জানা যায় নাই, ইহার পরে দ্বিজ জনার্দ্দনের চণ্ডী রচিত হয়; কিন্তু উহা কাব্য নহে, একটী সামান্য ব্রতকথা মাত্র। বলরামের চণ্ডী যদিও ইহার উপর একটু অধিক অগ্রসর হইয়াছিল; কিন্তু তখনও উহা কাব্যের আকার ধারণ করে নাই। তাঁহার কাব্যের উপাখ্যান অতি সংক্ষিপ্ত। বলরামের চণ্ডীতে কালকেতু ব্যাধের ও শ্রীমন্ত সওদাগরের দুইটী পৃথক পৃথক উপন্যাস নাই। কাল-কেতুর কথা শ্রীমন্তের উপাখ্যানেরই অন্তর্গত।

ধনপতি সওদাগর খুল্লনার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন। কিন্তু বাটী ফিরিবার সময় পথে তাহাকে একটু পিছাইয়া পড়িতে হয় এবং খুল্লনা আগে আসিয়া বাটীতে উপস্থিত হন। ধনপতির প্রথমা স্ত্রী লহনা স্বামীকে ফিরিতে না দেখিয়া মনে করেন যে সম্ভবতঃ ওই নারীই তাহার

কোন অনিষ্ট করিয়া থাকিবে, এবং তাহাকে কোন মায়াবিনী মনে করিয়া খুল্লনাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। অভাগিনী খুল্লনা সপত্নীর দারুণ শাসনে হৃতালঙ্কারা হইয়া বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন। ওই বনেই কালকেতু ব্যাধ ও তাহার পত্নী ফুল্লরা বাস করিত। তাহাদের সহিত একদিন খুল্লনার সাক্ষাৎ হইল। তাহারা অতি যত্নের সহিত খুল্লনাকে আশ্রয় দিল এবং মঙ্গলচণ্ডীর পূজা পদ্ধতি শিখাইয়া দিল। কবি বলরাম এই উপলক্ষেই কালকেতু ব্যাধের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। কালকেতু বনে গিয়া মৃগাদি মারিয়া আনিত, আর আনন্দের সহিত পরিবার প্রতিপালন করিত। এইরূপেই তাহার দিন কাটিতেছিল। কিন্তু একদিন সে বনে গিয়া দেখে যে তাহাকে দেখিয়া মৃগগণ পলাইয়া গিয়া মঙ্গলচণ্ডীর পদে শরণ লইতেছে। ব্যাধের ও পেটের চিন্তা দূর হয় আর মৃগগণও প্রাণে বাঁচে, ইহার একটা উপায় স্থির করিয়া দেবী স্বর্ণগোধিকারূপে ব্যাধকে দেখা দিলেন। ব্যাধ সেদিন অন্য কোন শিকার না পাইয়া তাহাকেই ঘরে লইয়া আসিল। দেবী ব্যাধের কুটীরে আসিয়া পরমা সুন্দরী রূপ ধারণ করিলেন এবং তাহাকে পাঁচ শত স্বর্ণাঙ্গুরী ও দুই ভাণ্ড স্বর্ণ দিয়া বলিলেন যে আজ হইতে তুমি আর বনে যাইয়া মৃগ মারিও না। ব্যাধ স্বীকৃত হইল, দেবীও অন্তর্দ্ধান করিলেন। কিন্তু সেইদিন হইতে কালকেতু ব্যাধ ও তাহার পত্নী ফুল্লরা চণ্ডীর বিশেষ ভক্ত বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইলেন। পৃথিবীতে কালকেতুর দ্বারা দেবীর পূজা প্রচারিত হইল। বলরামের চণ্ডীতে কালকেতুর গুজরাটে যাইয়া রাজ্যাদি স্থাপনের বা কলিঙ্গাধিপতির সহিত যুদ্ধের কথা নাই। মুকুন্দরামের কাব্যে কালকেতুর বিবাহ, পশুগণের সহিত যুদ্ধ, ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে চণ্ডীর সহিত ফুল্লরার কথোপকথন, কালকেতুর অঙ্গুরীয় ভাঙ্গাইতে বণিকালয়ে গমন ও ভাঁড়ু দত্তের চাতুরী প্রভৃতি যে সকল করুণ ও হাস্যরসাত্মক কাহিনীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, দ্বিজ জনার্দ্দন বা বলরামের চণ্ডীতে তাহার উল্লেখ মাত্র নাই। মুকুন্দরাম ক্ষুদ্র গীতিটী কাব্যে পরিণত করিবার সময়েই ওই অংশগুলি বাড়াইয়াছেন। ইহার পর শ্রীমন্তের উপাখ্যানেও মুকুন্দরাম বলরামের অপেক্ষা অনেক কথা বেশী বলিয়াছেন।

খুল্লনা ব্যাধের গৃহে চণ্ডীর পূজা শিক্ষা করিলে পর দেবী খুল্লনার পূজায় তুষ্ট হইলেন। ধনপতি যাইয়া তাঁহাকে বন হইতে লইয়া আসিল। নববধূ ঘরে আসিলে একটী 'বৌভাতের' আয়োজন করা হইল। কিন্তু এদিকে ধনপতির নয়জন মামা এক পণ করিয়া বসিল যে ধনপতির স্ত্রী খুল্লনা পূর্ণ যৌবনে বনে গিয়াছিল, তাহাকে পরীক্ষা দিতে হইবে; নহিলে তাঁহারা কেহ ধনপতির বাড়ীতে আহার করিবেন না। মুকুন্দরামের চণ্ডীতে এই পরীক্ষার কথা ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে লিখিত আছে। কিন্তু বলরামের চণ্ডীতে তাহা এই সময়েই ঘটিয়াছিল এরূপ উক্ত আছে। যাহা হউক খুল্লনা সতী ক্রমান্বয়ে ষোলটী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অগ্নি সংস্কৃত সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেন; সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। ইহার কিছুদিন পরে খুল্লনা গর্ভবতী হইলেন। এইবার ধনপতির বিদেশ গমনের পালা। মুকুন্দরাম ধনপতির বিদেশ গমনের এই কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, রাজভাণ্ডারে শঙ্খচন্দনাদির অভাব হওয়াতে ধনপতি সিংহল যাইতে আদিষ্ট হ'ন। দ্বিজ জনার্দ্দন লিখিয়াছেন যে ধনপতি বাণিজ্য করিবার জন্য সিংহল যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু বলরাম কবিকঙ্কণ ধনপতির সিংহল-গমনের অন্য কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে একদিন গর্ভবতী খুল্লনা গৃহের বারান্দায় বসিয়া আহার করিতেছিলেন এমন সময়ে একটী গর্ভবতী কাকও উড়িয়া আসিয়া তাহার সম্মুখস্থিত গৃহের চালে বসে এবং তাঁহাকে কিছু আহার চায়। কিন্তু খুল্লনা তাহার আশা পূর্ণ করেন নাই। পরদিন ঐ কাকও একটী সুন্দর মধুফল আনিয়া ঐরূপে বসিয়া আহার করিতে থাকে। খুল্লনা তাহা দেখিয়া ঐ কাকটীকে সেই ফলটী চাহেন। কিন্তু ঐ কাকটী তাঁহাকে বলে "কাল যখন তোমার আমি চারিটি ভাত চাহিয়াছিলাম তুমি আমায় তাহা দাও নাই। আজ আমি তোমায় ইহা দিব কেন?" খুল্লনা কাকের কথায় অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া স্বামীকে গিয়া সেই কথা বলেন। ধনপতি অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন যে একমাত্র সিংহলে শালবান রাজার বাগানে ঐ মধুফলের গাছ আছে, অন্য কোথাও নাই। কিন্তু যখন গর্ভবতী খুল্লনার ঐ ফলটী খাইতে ইচ্ছা হইয়াছে তখন উহা তাহাকে না দিলে সন্তান বিকলাঙ্গ

ভুটবে মনে করিয়া তিনি মধুফলের উদ্দেশ্যে সিংহলযাত্রা করেন। কিন্তু তাঁহার যাত্রাকালে খুল্লনা চণ্ডী পূজায় রত থাকায় উভয়ের সাক্ষাৎ হয় নাই। খুল্লনা স্বামীর সন্ধান না পাইয়া এবং তিনি কোথায় গিয়াছেন জানিতে না পারিয়া যখন বিশেষ দুঃখ কষ্টে দিন কাটাইতেছিলেন, সেই সময় একদিন চণ্ডীদেবী তাঁহাকে দেখা দিয়া একটী মধুফল দিয়া যান এবং তাঁহাকে তাঁহার স্বামীর সন্ধান জানাইয়া দিয়া বলিয়া যান যে ধনপতি সিংহলে মধুফল আনিতে গিয়া শালবান রাজার হস্তে বন্দী হইয়াছেন। যথাকালে খুল্লনার পুত্র শ্রীমন্ত ভূমিষ্ঠ হইল। দিনে দিনে কুমার চন্দ্রের ন্যায় বাড়িতে লাগিল। শুভদিনে শুভক্ষণ দেখিয়া একদিন খুল্লনা তাহাকে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পাঠাইয়া দিলেন। কুমার পাঠশালায় আসিয়া অন্য ছাত্রদিগকে তাহার হাতে খড়ি দিবার জন্য অনুরোধ করিল। কিন্তু জারজ কুমার বলিয়া ছাত্রগণ কেহই তাহার হাতে খড়ি দিতে রাজী হইল না। পুত্র দারুণ মনোবেদনা পাইয়া মাতার নিকট পিতার কথা উত্থাপিত করিল। খুল্লনা শ্রীমন্তকে সমস্ত পরিচয় দিলেন। শ্রীমন্ত বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত সাতখানি তরী লইয়া পিতার অন্বেষণার্থে সিংহল যাত্রা করিলেন। দ্বিজ জনার্দ্দনের চণ্ডীতেও শ্রীমন্তের সিংহল যাত্রার এইরূপ কারণ নির্দ্দেশ আছে। কিন্তু মুকুন্দরাম শ্রীমন্তের সিংহল যাত্রার অন্য কারণ লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে একদিন শ্রীমন্ত গুরুকে এক কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে; গুরু যে উত্তর দেন, তাহাতে ছাত্র তৃপ্ত হ'ন না—তাহার বদনে উপহাসের রেখা দেখা দেয়। গুরু বুঝিতে পারিয়া তাহাকে অকথ্য ভাষায় গালি দিলে শ্রীমন্ত মাতার নিকট পিতার সংবাদ জ্ঞাত হইয়া সিংহল যাত্রা করেন। শ্রীমন্ত চণ্ডীর কৃপায় পথে নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কালীদহে কমলে কামিনী দর্শন করতঃ সিংহলের রত্নমালা ঘাটে উপনীত হন। মুকুন্দরাম তাঁহার কাব্যে ধনপতি ও শ্রীমন্তের সিংহল যাত্রার যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা প্রায় একরূপ। শ্রীমন্তের ন্যায় ধনপতিও যাইবার সময় পথে কালীদহে কমলে কামিনী দর্শন করিয়া গিয়াছিলেন এবং রাজাকে তাহা দেখাইতে না পারিয়া রাজা কর্ত্তৃক বন্দীশালায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। বলরামের চণ্ডীতে ধনপতির কমলে কামিনী দর্শনের কথা নাই। তিনি মধুফল আনিতে রাজার বাগানে প্রবেশ করার দরুণ সিংহলের কারাগারে বন্দী হইয়াছিলেন। অতঃপর শ্রীমন্ত সিংহলে উপনীত হইলে যে সকল ঘটনা

ঘটিয়াছিল; উভয় চণ্ডীর বিবরণই প্রায় একরূপ; তবে দক্ষিণ মশানের সেই সকল রক্তারক্তি ব্যাপারের অবসানে শ্রীমন্তকে আর কালীদহে যাইয়া রাজাকে কমলেকামিনী দেখাইতে হয় নাই। দেবীর কৃপায় তিনি সেই মশানেই রাজাকে কমলে কামিনী দেখাইয়াছিলেন। মশানের যুদ্ধাবসানে যে রক্তের স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল, দেবীর আদেশে তাহাই কালীদহে পরিণত হয় এবং নরমুণ্ডগুলি পদ্মের দলের আকার ধারণ করে আর স্বয়ং চণ্ডী ভগবতী রূপ ধারণ করিয়া তাহার উপর উপবেশন করতঃ গণেশের মুখ চুম্বন করিতে থাকেন। অতঃপর শ্রীমন্ত শালবান রাজার কন্যা সুশীলাকে বিবাহ করিয়া পিতার সহিত গৃহে ফিরিয়া আসেন। পৃথিবীতে চণ্ডীর পূজা প্রচারিত হয়। বলরামের চণ্ডীতে শ্রীমন্তের চৌত্রিশ অক্ষরে স্তব, সুশীলার বারমাস্যা বর্ণন বা জয়াবতীর কথাদি কিছুই নাই।

বলরামের চণ্ডীর উক্ত উপাখ্যানটীর সহিত মুকুন্দরামের কাব্যের উপাখ্যানগুলি মিলাইয়া দেখিলে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে মুকুন্দরাম, বলরামের চণ্ডী হইতেই তাহার কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তবে ঐ সকল উপাখ্যানের মধ্যে যে সকল ঘটনা তাঁহার নিকট নিতান্ত অস্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হইয়াছিল তাহাই তিনি পরিবর্জন করিয়াছেন। এবং মধ্যে মধ্যে তিনি স্বীয় কল্পনার কোন রম্য দৃশ্য বা মনুষ্য-চরিত্র অংশের কোন বিচিত্র আদর্শ দেখাইতে গিয়া ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছেন। মুকুন্দরাম প্রথম শ্রেণীর কবি; কিন্তু বলরামের স্থান তাঁহার অনেক নিম্নে হইলেও মুকুন্দের চণ্ডীর পূর্ব্বে বলরামের চণ্ডী কাব্য-বিকাশের পূর্ব্বাভাষ দেখাইতেছে। বলরামের তুলিতে চণ্ডীকাব্যের যে সকল ছায়াপাত হইয়াছিল, মুকুন্দের বর্ণবিকাশ ক্রমে তাহারা সজীব সুন্দর চিত্র হইয়াছে। কাব্যামোদিগণ সে ছায়াপাত দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইতে না পারেন কিন্তু, সাহিত্যের ইতিহাস লেখকগণের নিকট তাহাদের মূল্য অনেক।

বলরাম কবিকঙ্কণ এই মেদিনীপুর জেলারই অধিবাসী ছিলেন এইরূপ প্রবাদ; কিন্তু তিনি মুকুন্দরামের কত দিন পূর্ব্বে ঠিক কোন সময়ে কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে অতি কষ্ট কল্পনায় এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে বলরাম কবিকঙ্কণ, কবি জনার্দনের পরে ও কবি মুকুন্দরামের পূর্ব্বে অর্থাৎ সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও ষোড়শ শতাব্দীর আদিভাগের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কাশীরাম দাস।

কবিকঙ্কনের পরে বঙ্গীয় কবি প্রতিভা কিছুকালের জন্য ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছিল। দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন যে এই সময় 'প্রকৃতি বাঙ্গালীর পর হইলেন—শাস্ত্র আপন হইল; ভাষা ভাবের অধিকার ছাড়িয়া স্বীয় স্বাতন্ত্র্য স্থাপন করিল এবং কবিগণ প্রকৃত মানুষ না দেখিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের ছবিগুলি দেখিয়া পাগল হইলেন।' এই সংস্কৃতের আনুগত্য বঙ্গসাহিত্যের বিরাট অনুবাদ চেষ্টায় বিশেষরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ওই সময় রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতাদি বহুসংখ্যক সংস্কৃত পুস্তক অনুবাদিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য সেগুলি অনুবাদ হইলেও কবিগণ তাহাদের মধ্যে নিজেদের কল্পনার ইন্দ্রজাল বিস্তার করিতে ক্রটি করেন নাই। ভাষার ভিত্তি দৃঢ় করিতে অনুবাদ গ্রন্থেরও সে সময় বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল। ওই সকল পুস্তক বঙ্গভাষায় সংস্কৃত শব্দ, অলঙ্কার, ছন্দ ও উপমারাশি বহুল পরিমাণে আমদানী করিয়া বঙ্গভাষার সম্পদও বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে। এই যুগের অনুবাদকগণের মধ্যে কাশীরাম দাসের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তিনিই এই যুগের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক।

কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের ন্যায় কাশীরাম দাসও মেদিনীপুরের অন্নজলে পুষ্ট হইয়া মহাভারত রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত আওয়াসগড়ের রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া পাঠশালার শিক্ষকতা করিতেন, রাজবাড়ীতে যে সমস্ত কথক ও পুরাণ পাঠক পণ্ডিত আসিতেন, তাঁহাদের মুখে তিনি মহাভারত শুনিয়া তাহাতে অনুরক্ত হ'ন এবং ওই অনুরাগের ফল পাঁচালীর ছন্দে মহাভারতের অনুবাদ। তবে যে কেহ কেহ ইহা হইতেই সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন যে কবি সংস্কৃত ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ও মূর্খ ছিলেন, কথক ও পাঠক প্রভৃতির মুখে ব্যাখ্যা শুনিয়াই তিনি মহাভারত ভাষায় লিখিতে প্রবৃত্ত হ'ন ইহা এক সম্পূর্ণ অমূলক অখ্যাতি মাত্র। কবি যে সংস্কৃত শাস্ত্রে এবং ভাষাতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন তাহার পরিচয় তাঁহার রচনার মধ্যেই যথেষ্ট পাওয়া যায়। কাশীরাম

দাসের মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বের একস্থানে একটী কবিতা দেখিতে পাওয়া যায় :—

"হরিহরপুর গ্রামে সর্ব্বগুণ ধাম।
পুরুষোত্তম-নন্দন মুখটি অভিরাম॥
কাশীদাস বিরচিল তাঁর আশীর্ব্বাদে।
সদা চিত্তরহে যেন দ্বিজ পাদপদ্মে॥"

এই হরিহরপুর গ্রাম কোথায় এবং কাশীরাম পুরুষোত্তম-নন্দন অভিরাম মুখোপাধ্যায়ের নিকট কিরূপ সাহায্য পাইয়া নিজের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন, তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই। মেদিনীপুরের লোকদিগের বিশ্বাস এই অভিরাম মুখোপাধ্যায়ই রাজবাটির প্রধান পুরাণ পাঠক পণ্ডিত ছিলেন এবং ওই আওয়াসগড়ের আটক্রোশ উত্তরে কেদারকুণ্ড পরগণার মধ্যে হরিহরপুর নামে যে প্রাচীন গ্রামটী আছে, তিনি সেই গ্রামেই বাস করিতেন। আওয়াসগড় মেদিনীপুর নগরীর অর্দ্ধক্রোশ উত্তরে বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর রাস্তার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। কর্ণগড়ের রাজাগণ কর্ত্তৃক এই গড়টি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এক্ষণে উহা মেদিনীপুর ও নাড়াজোলের অধিপতি রাজা নরেন্দ্রলাল খান বাহাদুরের সম্পত্তি।

কাশীরাম দাসের বিস্তৃত জীবনী জানিবার উপায় নাই। তিনি তাঁহার গ্রন্থের বহুস্থানে বিক্ষিপ্তভাবে আপনার যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে এইমাত্র জানা যায় যে কাশীরাম ইন্দ্রাণী পরগণার অন্তর্গত সিঙ্গী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার কায়স্থকুলে জন্ম, দেব উপাধি। তাঁহার প্রপিতামহের নাম প্রিয়ঙ্কর, পিতামহ সুধাকর, পিতা কমলাকান্ত। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম কৃষ্ণ দাস, কনিষ্ঠের নাম গদাধর। কৃষ্ণ দাস ও গদাধরও সুকবি বলিয়া পরিচিত।

অনুমান ১০০০ সালে কাশীদাস মহাভারত রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ১৩০৭ সালের সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায়" শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্-এ মহাশয় কাশীদাসের যে বিরাট পর্ব্বখানির বিবরণ দিয়াছেন তাহার শেষে লিখিত আছে—

"চন্দ্র বাণ পক্ষ ঋতু শক সুনিশ্চয়।
বিরাট হইল সাঙ্গ কাশীদাস কয়॥"

এখানে অঙ্কস্য বামা গতি না ধরিয়া দক্ষিণা গতি ধরিলে জানা যায় যে ১৫২৬ শকে ১০১১ সালে কাশীদাসের বিরাট পর্ব্বখানি শেষ হয়। ইহার পরে কবি স্বর্গারোহণ করেন। বিরাটপর্ব্বের শেষে পাওয়া যায়,—

"আদি, সভা, বন, বিরাট রচিয়া পাঁচালী।
যাহা শুনি সর্ব্বলোকে অতি কুতুহলি॥
পূর্ব্বে তেঁহ আরম্ভিয়া ছিল এই পুঁথি।
কালবশে মৃত্যু তার হৈল দৈবগতি॥"

মেদিনীপুরের প্রাচীন লোকদিগের নিকট শুনিতে পাওয়া যায় যে কাশীদাস ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের পিতৃ-পিতামহের নিকট হইতেই এইরূপ কথা শুনিয়া আসিতেছেন। কথাটার মধ্যে যে কতদূর সত্য নিহিত আছে তাহা নির্ণয় করিবার যদিও এক্ষণে কোন উপায় নাই তবে সে সময় যে ওই অঞ্চল নিবিড় জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন, ব্যাঘ্র, ভল্লুকাদি হিংস্র শ্বাপদে পরিপূর্ণ ছিল, তাহার যথেষ্ট নিদর্শন আছে।

কাশীদাসের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর, ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম ও আত্মীয় ভৃগুরাম দাস মিলিত হইয়া মহাভারতের অবশিষ্টাংশের অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন। কিন্তু ওই শেষাংশের অনুবাদ পূর্ব্ববর্ত্তী অনুবাদক নিত্যানন্দ ঘোষের রচনাকে মূলতঃ অবলম্বন করিয়া সঙ্কলিত হইয়াছিল। কাশীরামের পূর্ব্বে বিজয় পণ্ডিত, সঞ্জয়, কবীন্দ্র, পরমেশ্বর, নিত্যানন্দ ঘোষ প্রভৃতি আরও কয়েকজন কবি কয়েকখানি মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কাশীদাসের মহাভারতই সমধিক আদর প্রাপ্ত হইয়াছে। ভাষার প্রাঞ্জলতাই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়।

কবিত্ব বিষয়ে কাশীদাস কবিকঙ্কন অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার কবিত্ব শক্তি কম ছিল একথাও বলা যায় না। মহাভারতের নানাস্থানে তিনি তাঁহার কবিত্ব ও কল্পনা শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। । মহাভারতের ভাষাও চণ্ডীর ভাষা অপেক্ষা অনেক মার্জ্জিত ও স্পষ্ট। মহাভারত ছাড়া কাশীদাস "স্বপ্নপর্ব্ব" "জলপর্ব্ব" ও "নলোপাখ্যান" নামক আরও তিন খানি ছোট কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

কাশীরামের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ বঙ্গসাহিত্যের দুই কৌস্তুভমণি। এই দুই গ্রন্থই আমাদের সংসারে ন্যায় ধর্ম্ম এবং শিষ্টাচার শিক্ষার অন্যতম অবলম্বন। কবিবর রবীন্দ্রনাথ কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারতকে আমাদের সমস্ত জাতির মনের খাদ্য বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন— "মহানদী যেমন সকল দেশে নাই তেমনই মহাকাব্য পৃথিবীর অতি অল্প জাতির ভাগ্যেই জুটিয়াছে। আবার যে দেশের মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত সে দেশের সৌভাগ্যের অন্ত নাই। এই সৌভাগ্যের ফল যে কত সুদূর বিস্তৃত তাহা আমাদের স্বাভাবিক ঔদাসীন্য বশতঃই আমরা চিন্তা করিয়া দেখি না। একথা আমাদের নিশ্চিত জানা উচিত যে ভাগীরথী ও ব্রহ্মপুত্রের শাখা প্রশাখা যেমন আমাদের বঙ্গভূমিকে জলে ও শস্যে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, ঘরে ঘরে চিরদিন ধরিয়া আমাদের ক্ষুধার অন্ন ও তৃষ্ণার জল যোগাইয়া আসিতেছে, কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারতও তেমনই করিয়া চিরদিন আমাদের মনের অন্ন ও পানের অক্ষয় ভাণ্ডার হইয়া রহিয়াছে। এ দু'টী গ্রন্থ না থাকিলে আমাদের মানস প্রকৃতিতে কিরূপ শুষ্কতা ও চির দুর্ভিক্ষ বিরাজ করিত তাহা আজ আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন।" তিন শত বৎসর পূর্ব্বে মেদিনীপুর জেলার সেই নিভৃত পল্লীর কথকদিগের মুখে মহাভারতের কথা শুনিয়া কাশীরাম যে সংকল্প করিয়া তাঁহার মহাভারত রচনা করিতে বসিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ হইয়াছে।

সনাতন চক্রবর্ত্তী।

রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ প্রচার করিয়া যেরূপ বহুসংখ্যক কবি যশস্বী হইয়াছেন সেইরূপ বহু সংখ্যক কবি শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ করিয়া অথবা ভাগবতের অনুবর্ত্তী হইয়া বহুসংখ্যক গ্রন্থ রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ভাগবতের অনুবাদক এই জেলা নিবাসী দুঃখী শ্যাম দাসের নাম আমরা ইতি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ভাগবত অনুবাদকগণের মধ্যে গুণরাজ খাঁ উপাধিধারী মালাধর বসুর নাম প্রথম পাওয়া যায়। তৎপরে লাউড়িয়া কৃষ্ণ দাস ও মাধবাচার্য্যের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই তিন খানি গ্রন্থের কোন খানিই সমগ্র

ভাগবতের অনুবাদ নহে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য "শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী" নামে যে গ্রন্থ খানি লিখেন তাহাই সমগ্র ভাগবতের অনুবাদ। এই অনুবাদ খানি বেশ সুন্দর হইয়াছে। ইহার শ্লোক সংখ্যা প্রায় ২০০০০ হাজার। প্রাচ্য বিদ্যা মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদকতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক এই সুবৃহৎ কাব্য খানি প্রকাশিত হইয়াছে।

রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যের ন্যায় মেদিনীপুর নিবাসী কবি সনাতন চক্রবর্ত্তীও একখানি শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যানুবাদ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে এই গ্রন্থ খানি বিরচিত হয়। কবি ঔরংজিবের সঙ্গে সুজার যুদ্ধের সময় উল্লেখ করিয়া পুস্তক রচনার কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে এই গ্রন্থ খানির কতকাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে ভাগবতের প্রত্যেক শ্লোকের অনুবাদ দৃষ্ট হয়। আয়তনে উহা ভাগবতাচার্য্যের গ্রন্থের প্রায় দ্বিগুণ। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর নিকট উহার প্রায় সমস্ত পুঁথি খানি সংগৃহীত আছে।

কবি সনাতন চক্রবর্ত্তী মেদিনীপুর জেলার কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ বিশ্বকোষে এই কবিকে মেদিনীপুর অঞ্চলের অধিবাসী বলিয়া উল্লেখ করায় আমরাও এ স্থানে তাঁহার নাম উল্লেখ করিলাম।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী লেখক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন—"যে দেশে কোন গুণবান পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন সে দেশ সৌভাগ্যবান; কিন্তু যে দেশে গুণবানের সমকালে তাঁহাদের গুণের সমাদর করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান থাকেন, সে দেশ আরও অধিক সৌভাগ্যবান। পতিত বঙ্গভূমির বড়ই সৌভাগ্য যে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিগণ যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সে সময় তাঁহাদিগের গুণের সমাদর করিবার উপযুক্ত ব্যক্তির একান্ত অভাব হয় নাই। বঙ্গের আদি কবি বিদ্যাপতি হইতে মধুসূদন পর্য্যন্ত প্রত্যেকেরই

জীবনে এ কথা সপ্রমাণ হইতে পারে।" মেদিনীপুরের লক্ষ্মীর সন্তানগণের অনেকেরও বাণীর পুত্রগণের অভাব মোচনের জন্য সদাই মুক্ত ছিল। মুকুন্দরাম ও কাশীরামের ন্যায় বঙ্গের অন্যতম প্রাচীন কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও মেদিনীপুরের অন্নজলে পুষ্ট হইয়াছিলেন। মুকুন্দরাম ও কাশীরামের নামের সঙ্গে তাঁহাদের আশ্রয়দাতা মহাত্মাগণের নাম যেরূপ জড়িত সেইরূপ রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের নামের সঙ্গে তাঁহার আশ্রয় দাতা রাজা যশোবন্ত সিংহের নামও চিরদিন জড়িত থাকিবে।

কর্ণগড়াধিপতি রাজা যশোবন্ত সিং ও তাঁহার খ্যাতনামা পিতা রাজা রাম সিংহের নাম বাঙ্গালার ইতিহাসে বিশেষ বিখ্যাত। রাজা রায়দুর্লভ পাটনার শাসনকর্ত্তা রাজা রামনারায়ণ প্রভৃতি যে শ্রেণীস্থ ছিলেন ইঁহারাও সেই শ্রেণীস্থ ব্যক্তি বলিয়া ইতিহাসে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। রাজা রাম সিংহ ইতিহাসে "মেদিনীপুরের শাসন কর্ত্তা রাজারাম সিংহ" নামে অভিহিত হইয়াছেন। রাজা যশোবন্ত সিংহ বহুদিন যাবৎ ঢাকার দেওয়ানী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। প্রথিত আছে তাঁহার সময়ে দেশীয় লোকের সুখ সচ্ছন্দের সীমা ছিল না। যৎকালে শায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালার নবাব ছিলেন তখন তিনি টাকায় আট মণ করিয়া চাউল বিক্রয় করিয়াছিলেন এবং এই ঘটনাটী চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত ঢাকা নগরের পশ্চিম দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর লিখিয়া দিয়াছিলেন যে, যিনি চাউল এতাদৃশ সুলভ করিতে না পারিবেন তিনি এই দ্বার খুলিতে পারিবেন না। দেওয়ান যশোবন্ত সিংহ পুনরায় টাকায় আট মণ চাউল বিক্রয় করাইয়া সেই পশ্চিম দ্বারের কপাট উদ্ঘাটন করেন।

যশোবন্ত সিংহের উৎসাহেই রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য তাঁহার শিবায়ণ কাব্য রচনা করেন। যশোবন্ত সিংহ ১৭০৪ খৃঃ অব্দে ঢাকার দেওয়ানী পদপ্রাপ্ত হ'ন। শিবায়ণ রচনার সময় সম্বন্ধে কবি তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"শাকে হল্য চন্দ্রকলা রাম করা কোলে।
বাম হৈল বিধি কান্ত পড়িত অনলে॥
সেই কালে শিবের সঙ্গীত হল্য সারা।
অবনীতে আইল যেন অমৃতের ধারা॥"

এই শ্লোক হইতে স্পষ্ট কোন শক পাওয়া যায় না। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় অতি কষ্ট কল্পনায় উহা ১৬৩৪ শক (১৭১৪ খৃঃ অঃ) বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে কবি যশোবন্ত সিংহের দেওয়ান হইবার ২২ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার গ্রন্থ রচনা শেষ করিয়াছিলেন। রামগতি বাবু বলেন যে এই ২২ বৎসরের অন্তর ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। কারণ ইতিহাস হইতে দেখা যাইতেছে যে, দেওয়ানী লাভের পূর্ব্বেও যশোবন্ত প্রসিদ্ধ মুর্শিদকুলী খাঁর অধীনে বহুদিন থাকিয়া বিলক্ষণ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কবি শিবায়ণের অনেক স্থলেই যশোবন্ত সিংহও তাঁহার পিতার যশ প্রচার করিয়াছেন।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য ভট্টনারায়ণ বংশোদ্ভূত; শাণ্ডিল্য গোত্রীয় কেশর কনীর সন্তান। তিনি তাঁহার আত্মপরিচয় সম্বন্ধে শিবায়ণে যাহা লিখিয়াছেন—তাহা হইতে জানা যায় যে, তাঁহার প্রপিতামহের নাম গোবর্দ্ধন, পিতার নাম লক্ষ্মণ ও মাতার নাম রূপবতী। কবির দুই স্ত্রী ছিলেন—একজনের নাম সুমিত্রা, অপরের নাম পরমেশ্বরী। এতদ্ব্যতীত তাঁহার শম্ভুরাম ও সনাতন নামক দুই সহোদর, পার্ব্বতী, গৌরী ও সরস্বতী নামক তিন ভগিনী, দুর্গাচরণাদি নামে ছয় ভাগিনেয়, কৃষ্ণরাম নামে এক ভাগিনেয়ী পুত্র এবং হৃদয়রাম ও পরমানন্দ নামে দুই বন্ধুর কথাও কবি আমাদিগকে জানাইয়াছেন। কিন্তু তিনি স্বীয় পুত্র কন্যা সম্বন্ধে কোন কথাই লিখেন নাই। ইহাতে অনুমান হয় তাঁহার সন্তান হয় নাই।

মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী ঘাটাল নগরীর নিকটবর্ত্তী বরদা পরগণার যদুপুর গ্রামে রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্ব নিবাস ছিল; কিন্তু বরদা পরগণার জমিদার হেমৎ সিং অন্যায়রূপে তাঁহার উক্ত যদুপুরস্থ গৃহ ভগ্ন করিয়া দিলে কবি মেদিনীপুরের অন্তর্গত কর্ণগড়ের রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া উক্ত পরগণাস্থিত অযোধ্যাবাড় গ্রামে কাঁসাই বা কংসাবতী নদীর তটে বাস স্থাপন করেন। সেই কাঁসাই বা কংসাবতী তটকেই কবি "কৌশিকী তট" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। রামেশ্বর সংস্কৃত ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন। কর্ণগড়াধিপতি সেই কারণে তাঁহাকে রাজবাটীর পুরাণ পাঠ কার্য্যে নিযুক্ত করেন। রামেশ্বর দেবী মঙ্গলানী

পুরাণ পাঠক ছিলেন না। তিনি যে হিন্দু শাস্ত্রের বিশেষ মর্ম্মজ্ঞ ছিলেন, তাঁহার শিবায়ণ গ্রন্থেই তাঁহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

রামেশ্বরের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ শিবায়ণ। তিনি এই গ্রন্থে অন্যান্য পৌরাণিক কাব্যের ন্যায় প্রথমে দেব দেবীর বন্দনা, গ্রন্থের সূচনা, সৃষ্টি প্রকরণ, দক্ষযজ্ঞ বর্ণন করিয়া ক্রমে হরপার্ব্বতীর বিবাহ, শিবের ভিক্ষা, হরপার্ব্বতীর কোন্দল, শিবের কৃষিকার্য্যারম্ভ, বর্ষারম্ভে ভগবতীর বিরহ, মশা, জোঁকের উৎপাত শিবকে ছলিবার উদ্দেশ্যে ভগবতীর বাগ্দিনী বেশে তথায় গমন, শিবকে ঠকান, বাগ্দিনীর প্রতি শিবের অনুরাগ, ভগবতীর ক্রোধ, নারদের যত্নে দম্পতীর ক্রোধ শান্তি এবং মিলন, শিবের নিকট পার্ব্বতীর শঙ্খ পরিবার ইচ্ছা প্রকাশ, শিবের সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান, পার্ব্বতীর অভিমান ও পিত্রালয়ে গমন, শিবের শাঁখারী বেশে হিমালয়ে গমন এবং ভগবতীকে শাঁখা পরাইবার প্রসঙ্গে বাগ্দিনীরূপে প্রতারণার প্রত্যুত্তর দান ও হর গৌরীর পুনর্ম্মিলন প্রভৃতি প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে বর্ণন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন শিবায়ণে ধর্ম্ম কথা প্রসঙ্গে শিবের উক্তিতে রুক্মিণীব্রত, রাম নাম মাহাত্ম্য, বাণ রাজার উপাখ্যান এবং সতী মাহাত্ম্য ও ব্রতাদির অনেক কথা বর্ণিত আছে।

বাগ্দিনীরূপে গৌরীর শিবকে প্রতারণার স্থলটী পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় কবির স্বকপোল কল্পিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু দীনেশ বাবু বলেন যে এই গ্রন্থের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে ভগবতীর ডোম্নিনী রূপে শিবকে প্রতারণার কথা আছে। তিনি লিখিয়াছেন "শিবের গীত বঙ্গসাহিত্যে অতি প্রাচীন বিষয়; কালে শিব বিবাহের কথা স্বতন্ত্র কাব্যের বিষয় না হইয়া প্রাচীন অনেকগুলি কাব্যের অংশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল; পদ্মপুরাণ ও চণ্ডী কাব্যগুলিতে "শিবের বিবাহ," "হরগৌরী কোন্দল" প্রভৃতি গ্রন্থারম্ভে বর্ণিত হইতে দেখা যায়, এই শিব প্রসঙ্গও কবিগণের উপর্য্যুপরি চেষ্টায় সুন্দররূপে বিকাশ পাইয়াছে। বৃদ্ধ ও তরুণীকে এক গৃহস্থালীর হাতে ছাড়িয়া দিলে যে সব দুর্গতি ঘটে, তাহা নির্ম্মল হাস্যের সহিত দর্শন করিয়া রামেশ্বর প্রভৃতি কবিগণ শিবপ্রসঙ্গ উপলক্ষে কয়েকখানি কৌতুক চিত্র সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন।"

রামেশ্বর শিব কর্ত্তৃক গৌরীকে শঙ্খ পরাণ প্রসঙ্গে ঐরূপ একখানি কৌতুক-চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। শিবের চাষ ও শিবের শঙ্খ পরিধানের প্রসঙ্গেই শিবায়নের প্রায় অর্দ্ধাংশ পরিপূর্ণ। ধরিতে গেলে এই দুই প্রসঙ্গ লইয়াই শিবায়ন। পার্ব্বতী একদিন শিবকে দু'গাছি শাঁখা চাহিয়াছিলেন; শিব তাহা দিতে অস্বীকৃত হইয়া নিজের বাড়ীর অবস্থার কথা বুঝাইয়া দেবীকে কিছু শ্লেষ সহকারে বলেন:—

"ভাত নাই ভবনে ভর্ত্তার ভাগ্য বাঁকা।
মিন্‌সে মরে জন খেটে মাগী মাগে শাঁখা॥
কেমন তোমার দেখি বিপরীত ধারা।
রহিতে আমারে ঘরে নাহি দিবে পারা॥
ভিখারীর ভার্য্যা হয়ে ভূষণের সাধ।
কেন অকিঞ্চন সনে কর বিসম্বাদ॥
বাপ বটে বড়লোক বল গিয়া তারে।
জঞ্জাল ঘুচুক যাও জনকের ঘরে॥
সেইখানে শঙ্খ পরি সুখ পাবে মনে।
জানিয়া জনক গৃহে যাও এইক্ষণে॥"

এই কথা দ্বারা শিব দেবীকে ভয় দেখাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু দেবী তাহার শোধ তুলিলেন:—

"দণ্ডবৎ হইয়া দেবের দুটি পায়।
ক্ষান্ত মনে ক্রোধ করি কাত্যায়নী যায়॥
কোলে করি কার্ত্তিকেয়, হস্তে গজানন।
চঞ্চল চরণে হৈল চণ্ডীর চলন॥
গোড়াইল গিরীশ গৌরীর পিছু পিছু।
শিব ডাকে শশিমুখী শুনে নাই কিছু॥
বিদায় দারুণ দিবা দিল দেব রাও।
আর গেলে অম্বিকা আমার মাথা খাও॥
করে কর্ণ চাপিয়া চলিল ভগবতী।
ভাবিল ভাইয়ের কিরা ভবানীর পতি॥

ধাইয়া ধূর্জ্জটি গিয়া ধরে ছুটি হাতে।
আড় হইয়া পশুপতি পড়িলেন পথে॥
'যাও যাও যত ভাব জানা গেল' বলি।
ঠেলিয়া ঠাকুরে ঠাকুরাণী গেলা চলি॥
চমৎকার চন্দ্রচূড় চারিদিকে চায়।
নিবারিতে নারিয়া নারদ পাশে ধায়॥
রামেশ্বর ভাবে ঋষি দেখ বসে কি।
পাথারে ফেলিয়া গেলা পর্ব্বতের ঝি॥"

এই চিত্রখানির মধ্যে বঙ্গ-সংসারে তরুণী ভার্য্যার হাতে বৃদ্ধ স্বামীর যেরূপ লাঞ্ছনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে, তাহার একটী নিখুঁত চিত্র আমাদের চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাই। দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন,—"এই পাথারে ফেলিয়া গেলা পর্ব্বতের ঝি' ছত্রে তরুণী ভার্য্যার শ্রীপাদপদ্মে বিক্রীত বৃদ্ধ গৃহস্থের মহাবিপদ হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমরা একটু কৌতুক ও হাস্য উপভোগ করিয়া লইয়াছি, ইহা উচিত না হইলেও আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক কি না?"

শিবের চাষ সম্পর্কীয় উপাখ্যানটিও বিশেষ হাস্যোদ্দীপক। দরিদ্রের সংসার, গৌরী পাকা-গৃহিণী বলিয়াই কোন রকমে কায়ক্লেশে এতদিন সংসারটা চালাইয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু যখন নিতান্ত অচল হইয়া উঠিল, আর শিবেরও দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগাটা ভাল দেখাইতেছিল না, তখন একদিন দেবী অনেক বুঝাইয়া শুঝাইয়া শিবকে চাষ করিবার জন্য পরামর্শ দিলেন; কিন্তু শুধু পরামর্শ দিলে ত হয় না,—মহাদেব এখন মহা ভাবনায় পড়িলেন—চাষ করিতে হইলে যে বীজ-ধানের দরকার, কৃষক ও বলদ চাই, চাষের লাঙ্গলজোয়াল চাই, জমি চাই—এ সকল এখন তিনি পান কোথায়? শিবের চিন্তা দেখিয়া গৌরী তাঁহাকে ইন্দ্রের নিকট জমি গ্রহণের পরামর্শ দিলেন;—আর—

"কাত্যায়নী ক'ন কান্ত কিছু নাই কেন।
কুবেরের বাটি বীজ বাড়ি করি আন॥
ঘরে আছে বুড়া এঁড়ে ধরে মহাবল।
যমের মহিষ আন বাঁধিবার লাঙ্গল॥

ভীম আছে হালুয়া আর অনির্ব্বাহ কি ?
হর বলে দ্বন্দ্ব কৈলে হেমন্তের ঝি ॥"

শিব তখন ইন্দ্রালয়ে গমন করিয়া ইন্দ্রকে বলিলেন :—

"তুমি ভূমি দিলে আমি চষি গিয়া চাষ।
পূর্ণ হয় তবে পার্ব্বতীর অভিলাষ ॥"

ইন্দ্র বলিলেন :—"ভৃত্যে কেন ভূমি মাগ ভূস্বামী হয়ে।
যত প'র জোত কর কাজ নাই করে ॥"

"শিব বলে শক্র কিছু চক্র বক্র আছে।
খন্দ হলে ক্ষেতে তুমি স্বত্ব কর পাছে ॥
বিষয়ীর বচনে বিশ্বাস বিধি নয়।
পাট্টা খানি পেলে পরিণাম শুদ্ধ হয় ॥"

ইহা শুনিয়া— "করে লয়ে মসী পাত্র কশ্যপের ব্যাটা।
দেব-দেবে লিখে দিলা দেবত্তর পাট্টা ॥"

তৎপরে— "ডম্বুরের ডোরে পাট্টা বাঁধি দিগম্বর।
ইন্দ্রকে আশীষ করি যান যম ঘর ॥
সূর্য্য-সুত সাদরে শিবের সেবা করে।
আজ্ঞা মাত্র মহেশে মহিষ দিল ধরে ॥
তুষ্ট হয়ে ত্রিলোচন তারে দিয়া বর।
বিষাণ বাজায়ে বৃষধ্বজ যান ঘর ॥"

অতঃপর বাড়ীতে আসিয়া শিব চাষ আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ কায়স্থেরা যেমন স্বহস্তে চাষের কর্ম্ম না করিয়া কৃষকদের দ্বারা তাহা করাইয়া লয়েন এবং আপনারা ক্ষেত্রে নিয়ত উপস্থিত থাকিয়া শস্যাদির তত্ত্বাবধান করেন, শিবও তাহাই করিয়াছিলেন। শেষে ব্রাহ্মণ কায়স্থের চাষ যেরূপ কোন দিন ভাল হয় না, শিবের চাষেও তাহাই ঘটিয়াছিল। শিব-ভৃত্য ভীম ধান্য কাটিয়া আড়াই হালা মাত্র ধান্য গাছে প্রাপ্ত হ'ন। শিব ক্রোধান্বিত হইয়া খড় সমেত সেই গাছ পুড়াইয়া দিবার আদেশ দিলেন। বার বৎসর ধরিয়া ধান্য পুড়িতে লাগিল। তৎপরে শিব প্রসন্ন হইলে, সেই দগ্ধ ধান্য হইতে পৃথিবীতে বিবিধ বর্ণের ধান্যের উৎপত্তি হইয়াছে।

শিবের এই চাষের কথা বহু বিস্তীর্ণ ও নানাপ্রকার হাস্যোদ্দীপক কাহিনীতে পূর্ণ। স্থানাভাব বশতঃ আমরা উহার কোন অংশই উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। রামেশ্বর এই উপাখ্যানটি কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন জানা যায় নাই, তবে উহা যে তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত নহে তাহা বলা যাইতে পারে। রামেশ্বরের বহু পূর্ব্ব হইতেই এই উপাখ্যানটী দেশ মধ্যে প্রচলিত ছিল। মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতির ঐতিহাসিক অনুসন্ধান-কারী শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিতের লিখিত "আদ্যের গম্ভীরা" নামক সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে শিবের চাষ বিষয়ক গীত আদ্যের গম্ভীরাতেও গীত হইত। এখনও মালদহ, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলার গম্ভীরা মধ্যে ধান্য চাষের উৎসব আচরিত হইয়া থাকে। পশ্চিম বঙ্গের মেদিনীপুর, হুগলী, ২৪ পরগণা, বর্দ্ধমান, বীরভূম, নবদ্বীপ প্রভৃতি জেলার গাজনেও সন্ন্যাসীগণ কর্ত্তৃক এই শিবের চাষের কথা গীত হইয়া থাকে। শিবের এই চাষ সম্পর্কীয় উপাখ্যানটির তাৎপর্য্য কি, তাহা আমরা জানি না। তবে কৃষক জাতির দ্বারা কৃষি হইলে ঠিক হয় এবং দগ্ধ উদ্ভিদে ভূমির সার জন্মে, এই তত্ত্ব উহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতে পারে। অনেক দেশে ক্ষেত্রের মধ্যে ধান্যের নাড়া জ্বালিয়া দিবার রীতি আছে। তাহাতে ভূমির শস্য প্রসব-শক্তি বৃদ্ধি হয়।

রামেশ্বর শিবায়নের অনেক অনেকটি স্থলে বিলক্ষণ চতুরতা, বিলক্ষণ পরিহাস রসিকতা ও বিলক্ষণ কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কার্ত্তিক গণেশের বিবাদ, পিতা পুত্রের ভোজন, হরগৌরীর কন্দল প্রভৃতি স্থান-গুলিও বিশেষ প্রীতিকর। প্রদর্শনার্থ একটী স্থল উদ্ধৃত হইল।—মহাদেব পুত্রদ্বয়কে লইয়া আহারে বসিয়াছেন, ভগবতী পরিবেশন করিতেছেন—

"তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী।
দুটী সুতে সপ্ত মুখ পঞ্চ মুখ পতি॥
তিন জনে একুনে বদন হ'ল বার।
গুটী গুটী দুটী হাতে যত দিতে পার॥
তিন জনে বার মুখ পাঁচ হাতে খায়।
এই দিতে এই নাই হাঁড়ি পানে চায়॥

শুক্তা খেয়ে ভোক্তা চায় হস্ত দিয়া নাকে।
অন্নপূর্ণা অন্ন আন রুদ্র মূর্ত্তি ডাকে॥
শুক গণপতি ডাকে অন্ন আন মা।
হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য্য হয়ে থা॥
মুষিকী মায়ের বাক্যে মৌন হয়ে রয়।
শঙ্কর শিখায়ে দেন শিখিধ্বজ কয়॥
রাক্ষস ঔরসে জন্ম রাক্ষসীর পেটে।
যত পাব তত খাব ধৈর্য্য হব বটে॥
হাসিয়া অভয়া অন্ন বিতরণ করে।
ঈষদুষ্ণ সূপ দিল বেসারীর পরে॥
লম্বোদর বলে শুন নগেন্দ্রের ঝি।
সূপ হ'ল সাঙ্গ আন আর আছে কি॥
দড়বড় দেবী এনে দিলা ভাজা দশ।
খেতে খেতে গিরীশ গৌরীর গান যশ॥
সিদ্ধিদল কোমল ধুতুরা ফল ভাজা।
মুখে ফেলে মাথা নাড়ে দেবতার রাজা॥
উদ্ধন চর্ব্বণে ফিরে ফুরাল ব্যঞ্জন।
এককালে শূন্য থালে ডাকে তিন জন॥
দিতে দিতে গতায়তে নাহি অবসর।
শ্রমে হলো সজল কোমল কলেবর॥
ইন্দু মুখে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম বিন্দু সাজে।
মৌক্তিকের শ্রেণী যেন বিদ্যুতের মাঝে॥"

অন্নদানে গৃহিণীর এ আনন্দের ছবি এখন শিল্পশিক্ষা এবং উন্নত সাহিত্যিক রস-পিপাসু রমণীবর্গের নিকট ভাল বোধ হইবে কিনা জানিনা, কিন্তু ইহাই খাঁটি হিন্দু গৃহিণীর ছবি।

রামেশ্বর একজন খুব বড় কবি ছিলেন না। যে গুণে তাঁহার প্রায় সমসাময়িক কবি ভারতচন্দ্র প্রথম শ্রেণীর কবিগণের মধ্যে স্থান পাইয়াছেন রামেশ্বরের সে গুণ ছিল না। ভারতচন্দ্রের সহিত তাঁহার কবিত্বের

তুলনা হয় না ; তবে ভাবের গুরুত্ব হিসাবে বিচার করিতে গেলে রামেশ্বরের স্থান ভারতচন্দ্রের বিশেষ নীচ হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন যে একখানি সুন্দর ছবি দেখিতে চক্ষুর যে তৃপ্তি, ভারতের কবিতা পাঠে সেইরূপ তৃপ্তিলাভ সম্ভব। কিন্তু চিত্রকর হইতে কবির উচ্চতম প্রশংসা প্রাপ্য ; চিত্রকরের চিত্র কবির মন্ত্রপূত তুলির স্পর্শে প্রাণ পায়। ভারতচন্দ্রের তুলি প্রাণ দান করিতে পারে নাই। তাঁহার কাব্যে কোন স্থানেই হৃদয়ের ব্যাকুলতা নাই। হৃদয়ের মর্ম্মস্পর্শী দুঃখ কি স্নিগ্ধ সুখধারা তাঁহার কাব্যের কোন অংশ পবিত্র করে নাই। ভারতের "অন্নদামঙ্গল" তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। কিন্তু কবি উহার অঙ্কিত কোন চরিত্রেই জীবনের কোন গূঢ় সমস্যা কি কঠোর পরীক্ষার অবতারণা করিয়া আদর্শ চরিত্র বল দেখাইতে পারেন নাই। তিনি "নির্ব্বাত নিষ্কম্প দীপশিখা"র ন্যায় মহাযোগী মহাদেবকে একটা বেদিয়ার মত চিত্রিত করিয়াছেন ; দেবর্ষি নারদ, যাঁহার স্থান প্রহ্লাদ এবং শুকদেবেরও অনেক উচ্চে, তিনি তাঁহাকে একটা ঢেঁকির উপর চড়াইয়া দেশে দেশে ঘুরাইয়া সাপের মন্ত্র বকাইতেছেন ; মেনকা উমার মা, যিনি বঙ্গের আদর্শ গৃহিণী, আদর্শ জননী, আদর্শ শ্বশ্রূ, তিনি ভারতচন্দ্রের হাতে পড়িয়া একটী বিকটাকার মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছেন। রামেশ্বর কিন্তু সেরূপ করেন নাই। তাঁহার চরিত্র-চিত্রণ স্বর্গের উচ্চ আদর্শের সন্নিহিত না হইলেও তিনি বাঙ্গালীর ঘরের সুখ দুঃখের কয়েকটী সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার শিব, দুর্গা, কার্ত্তিক, গণেশ, প্রত্যেকেই বঙ্গ সংসারের এক একটী জীবন্ত ছবি। রামেশ্বর কোন গভীর ভাবের উদ্রেক করিতে না পারিলেও তাঁহার কাব্যের আদ্যোপান্তে কবির মার্জ্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্র তাঁহার গ্রন্থে আদি রসের যেরূপ নীরবগুণ্ঠন বর্ণনা করিয়াছেন, রামেশ্বর সেরূপ করেন নাই।

রামেশ্বরের শিবায়নের রচনায় প্রধানতঃ দুইটী দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ শিবায়নে করুণ রসের বড়ই অভাব। করুণ রস না থাকিলে কোন কাব্যই মনকে আর্দ্র করিতে পারে না। কবি এই গ্রন্থের কোন স্থলেই করুণ রসের উদ্দীপ্তি করিতে পারে নাই। দ্বিতীয়তঃ রামেশ্বরের রচনা

অতিরিক্ত অনুপ্রাস দোষে দুষ্ট। স্থানে স্থানে অনুপ্রাস সকল বেশ মিষ্ট লাগিলেও স্থল বিশেষে বিলক্ষণ কর্কশও বোধ হয়। তবে কবি সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন বলিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব শব্দযত্নে রচনাবলী মোটের উপর বেশ কোমল হইয়াছে, অথচ বিশদ হয় নাই। শিবায়নের মধ্যে স্থানে স্থানে কুমারসম্ভবাদি সংস্কৃত গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক প্রাচীন অধ্যাপকে কবিকঙ্কনের শ্লোকের ন্যায় শিবায়নেরও অনেক শ্লোক আদরপূর্ব্বক আবৃত্তি করিয়া থাকেন।

রামেশ্বর কৃত শিবায়ন গ্রন্থ ১২৭০ সালে (১৭৮৫ শকে) "সংবাদ-পূর্ণ চন্দ্রোদয়" যন্ত্রে প্রথম মুদ্রিত হয়। যিনি এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তিনি ইহার "শিব-সঙ্কীর্ত্তন" নাম দেন। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ও তাঁহার গ্রন্থে ইহাকে ঐ নামেই অভিহিত করিয়াছেন। ভণিতাতে রামেশ্বর কোন কোন স্থলে "বিরচিল শিব সংকীর্ত্তন" বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা এই গ্রন্থের নাম নির্দ্দেশক নহে। প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে ইহার শিবায়ন নাম লিখিত আছে। আমার পিতৃব্য প্রতিম স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয় যখন বঙ্গবাসী প্রেস হইতে প্রকাশিত এই গ্রন্থের সম্পাদন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি বহুসংখ্যক হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথির পাঠ মিল করিয়া ইহা শিবায়ন নামে প্রকাশিত করেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার 'বিশ্বকোষে' এই নামই গ্রহণ করিয়াছেন।

শিবায়ন মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান জেলায় চিরদিন গায়কদিগের দ্বারা গীত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন দুর্গোৎসবের সময় এ প্রদেশের অনেকের গৃহেই চণ্ডীপাঠের ন্যায় চণ্ডীমঙ্গল ও শিবায়ন গ্রন্থ পাঠ হইয়া থাকে। চণ্ডীমঙ্গল ষোলপালা গীত; শিবায়ন আট পালা। গায়কগণ পালাক্রমে এই সকল গীত গান করে।

রামেশ্বর শিবায়ন ব্যতীত একখানি "সত্যনারায়ণের কথা"ও রচনা করিয়াছিলেন। এ প্রদেশে বর্ত্তমান সত্যনারায়ণের যে পাঁচালী প্রচলিত

আছে, উহা রামেশ্বরের রচনা। কবি ভণিতায় কোন কোন স্থলে আপনাকে "দ্বিজরাম" নামেও অভিহিত করিয়াছেন। কথিত আছে স্কন্দ পুরাণোক্ত সত্যনারায়ণই এদেশে যবন সংসর্গে সত্যপীর হইয়াছিলেন। এ প্রদেশে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক পয়ারাদি গীত হইত। রামেশ্বর সেগুলি অবলম্বন করিয়াই এই গীতি কাব্যখানি রচনা করেন।

রামেশ্বর সত্যপীরের কথায় ঈশ্বরের পীরত্ব পরিগ্রহের একটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"কলিতে যবন দুষ্ট, হৈন্দবি করিল নষ্ট, দেখি রহিম বেশ হৈল রাম॥"—ইহাতে বোধ হয় যে, যে সময় মুসলমান রাজপুরুষগণ তাঁহাদের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য হিন্দুদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন সেই সময় হিন্দুরা তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিবার জন্য স্কন্দপুরাণোক্ত সত্যনারায়ণ দেবতাকে সত্যপীর আখ্যা দিয়া দেশমধ্যে তাঁহার পূজা প্রবর্ত্তিত করেন। কিন্তু দীনেশ বাবু ইহার অন্য একটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন— "বহুদিন একত্র বাস নিবন্ধন হিন্দু ও মুসলমানগণ পরস্পরের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কতকটা উদার ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। সত্যপীর নামক মিশ্র-দেবতার পূজা সেই উদারতার ফল।"

কথিত আছে রামেশ্বর বড় ঈশ্বরপরায়ণ ছিলেন। হিন্দুশাস্ত্র মতে তিনি শক্তি উপাসক ছিলেন। পবিত্র-সলিলা কংসাবতীতটে তাঁহার এক যোগাসন ও কর্ণগড়ের প্রাচীন মহামায়ার মন্দিরে তাঁহার আর এক যোগাসন ছিল। তিনি সেই স্থানে ভগবতী মহামায়ার সম্মুখে পঞ্চমুণ্ডী যোগাসনে বসিয়া যোগসাধন করতঃ সিদ্ধ হইয়াছিলেন। ভক্তপ্রধান রামেশ্বরের সম্বন্ধীয় অনেক কাহিনী এখনও মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচলিত আছে। অযোধ্যাবাড় গ্রামে একটী স্থান "রামেশ্বর ভিটা" বলিয়া অদ্যাপি নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অনুমান অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রামেশ্বর মানবলীলা সম্বরণ করেন।

ঘনরাম চক্রবর্ত্তী।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের লিখিত সংস্কার-যুগের আর একটী রত্ন ঘনরাম চক্রবর্ত্তী। ১৬৬৯ খৃঃ অব্দে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত খণ্ডঘোষ থানার অধীন কৃষ্ণপুর গ্রামে ঘনরাম জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম গৌরীকান্ত, মাতার নাম সীতাদেবী। ঘনরামের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ শ্রীধর্ম্মমঙ্গল। ১৭১৩ খৃঃ অব্দে ঘনরাম তাঁহার কাব্যখানি প্রণয়ন করেন। ঘনরামের পূর্ব্বে ময়ূর ভট্ট, রূপরাম, মাণিক গাঙ্গুলী, খেলারাম, সীতারাম প্রভৃতি আরও কয়েকজনের কয়েকখানি ধর্ম্মমঙ্গল ছিল। ঘনরাম সেই সকল গ্রন্থ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার কাব্য রচনা করেন। ঘনরামের পরে সহদেব চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক লেখকও একখানি ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু ঘনরামের গ্রন্থখানিই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হওয়াতে অধিকতর প্রচারলাভ করিয়াছে। কিছুদিন হইল সাহিত্য পরিষদ হইতে মাণিকরামের ধর্ম্মমঙ্গলখানিও প্রকাশিত হইয়াছে। ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল ২৪ অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত; মোট শ্লোকসংখ্যা ৯১৪৭। ঘনরাম রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের ন্যায় যদিও মেদিনীপুর জেলার অধিবাসী ন'ন বা মুকুন্দরাম ও কাশীরামের ন্যায় মেদিনীপুরের অন্নজলেও পুষ্ট হ'ন নাই, কিন্তু তাহা না হইলেও তাঁহার নামের সহিতও মেদিনীপুরের নাম চিরদিন জড়িত থাকিবে।

বঙ্গবাসীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় ধর্ম্ম-মঙ্গলের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন—"কাব্যের গল্প উপকথা নহে, মস্তিষ্কের বিকৃতি নহে—বাস্তবঘটনা এ কাব্যের একাংশীভূত। এই কাব্য ঐতিহাসিক, তবে কবিকল্পনায় ইতিহাস কাব্যরূপে পরিণত হইয়াছে। বঙ্গদেশ যখন স্বাধীন ছিল, পালবংশীয় রাজগণ যখন গৌড়ের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেন, যখন বাঙ্গালী বীরের পদভরে বঙ্গভূমি কাঁপিত,—সেই সময়—বঙ্গের সেই শুভ সময়—এ কাব্যের উৎপত্তি কাল। ধর্ম্মের অবতার শান্তমূর্ত্তি, রণনিপুণ, অমিত সাহসী লাউসেন এই কাব্যের নায়ক। এই মেদিনীপুর জেলাতেই তাঁহার জন্মভূমি। লাউসেন গৌড়েশ্বরের শালিকাপুত্র।

তাঁহার পিতার নাম কর্ণ সেন, পুত্রের নাম চিত্র সেন। কর্ণ সেন পাল বংশীয় রাজগণের অধীনে এ প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ময়না গড়ে তাঁহার রাজধানী ছিল। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে লাউসেনের যে সকল কীর্ত্তির কথা উল্লিখিত আছে, তাহা কবি-কল্পনায় জড়িত হইলেও ভিত্তিশূন্য নহে। লাউসেন যে অপূর্ব্ব পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া ঢেকুরবাসী ইছাই ঘোষকে, সিমুলিয়ার রাজা হরি পালকে এবং কামরূপের রাজা কর্পূরধল প্রভৃতি বিখ্যাত যোদ্ধৃবর্গকে গৌড়েশ্বরের বশীভূত করিয়াছিলেন, যে আশ্চর্য্য চরিত্রবলে কুলটাগণের কুহক হইতে আপনার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন এবং যে অপূর্ব্ব কৌশলে মাতুল মহামদের ষড়যন্ত্রগুলি একে একে নিষ্ফল করিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহার বৃত্তান্ত কাব্যের অতিরঞ্জনে ও কল্পনাবাহুল্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেও মূলতঃ তাহাদের ঐতিহাসিকত্বে আমাদের সংশয় নাই। লাউসেন একজন প্রধান কীর্ত্তিমান পুরুষ না হইলে হিন্দু পঞ্জিকায় কলিযুগের রাজচক্রবর্ত্তীগণের মধ্যে যুধিষ্ঠিরাদির নামের সঙ্গে তাঁহার নাম উল্লিখিত হইত না।

অজয় নদের তীরে ইছাই ঘোষের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্টিগোচর হয়। পণ্ডিতপ্রবর হাণ্টার সাহেব কৃত "Annals of Rural Bengal" নামক গ্রন্থে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। সিমুলিয়ার যে স্থানে রাজা হরি পালের বাটি ছিল অধুনা তাহা সিমুল গড় নামে পরিচিত। সিমুলিয়ার সন্নিকটবর্ত্তী একটী স্থান হরিপালের নামেই পরিচিত। হরি পালের বিস্তৃত রাজধানীর চিহ্ন এখনও একবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই, তাহার কতকাংশ "বাহির খণ্ড" নামে সুপরিচিত। যে ময়না গড়ে লাউসেনের রাজধানী ছিল সে ময়না গড়ের অস্তিত্ব এখনও রহিয়াছে; কিন্তু সে রাজবংশের অস্তিত্ব অনেক দিনই লোপ হইয়া গিয়াছে। রাজধানীর ভগ্ন প্রাসাদ এখন স্তূপীকৃত, জঙ্গলময়। যাহা আছে কিছুদিন পরে তাহাও ধ্বংস হইয়া যাইবে, কিন্তু কবিগণ তাঁহাদের মন্ত্রপূত তুলির স্পর্শে যে চিত্র আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে। যতদিন বঙ্গসাহিত্য থাকিবে, ততদিন ময়না গড়ের রাজবংশের অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকলাপ বর্ণিত হইতে থাকিবে, আর মেদিনীপুরের সহিত বঙ্গসাহিত্যের এই সম্বন্ধের কথাটুকুও জাগ্রত থাকিবে।

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের ঐতিহাসিক অংশ ছাড়া আর একটী বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদেশে যখন বৌদ্ধপ্রভাব মন্দীভূত হওয়ায় হিন্দুধর্ম্ম আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছিল, সেই সময় বৌদ্ধধর্ম্ম এদেশের নিম্ন শ্রেণীর হাতে পড়িয়া যে বিকৃত ভাব ধারণ করে ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলি তাঁহারই হিন্দু সংস্করণ। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলি বৌদ্ধ রাজা ও ভিক্ষুগণের মহিমা কীর্ত্তন করিতেই প্রথম রচিত হইয়াছিল। মনসা মঙ্গল, চণ্ডীকাব্য প্রভৃতি গ্রন্থে নায়ক নায়িকার চরিত্র ও কার্য্যাবলীর আলোচনা করিয়া পরিশেষে যেরূপ দেবতা বিশেষের মাহাত্ম্য প্রচারিত করা হইয়াছে ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যেও তদ্রূপ ধর্ম্মের অবতার লাউসেন ও মহাশক্তি ভগবতীর সেবক ইছাই ঘোষের কার্য্যাবলীর মধ্য দিয়া ধর্ম্মপূজার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। রামাই নামক একজন ডোম পণ্ডিত এই ধর্ম্মপূজার প্রধান পাণ্ডা ছিলেন। পরবর্ত্তী কালে 'ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ হস্তে শ্রমনগন হৃতসর্ব্বস্ব ও পরাভূত হইলে ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধ ভিক্ষুর আসনগুলিও আয়ত্ব করিয়া ভারত-বিজয়ী যে বিরাট পূজার আয়োজন করিলেন,—তাহাতে বাইতি, হাড়ি, প্রভৃতি জাতীর ধর্ম্মযাজকত্ব রক্ষিত হইল না; ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য ব্রাহ্মণগণের হাতে পড়িয়া দেবলীলা জ্ঞাপক হইল'; ঘনরাম চক্রবর্ত্তী, সহদেব প্রভৃতির রচিত ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলি তাহারই নিদর্শন। কিন্তু তাহা হইলেও অনুসন্ধান করিলে এখনও ইহার মধ্যে ক্ষীণ ও পরাভূত বৌদ্ধধর্ম্মের লুক্কায়িত ছায়া পরিলক্ষিত হইবে। *

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে কবি ধর্ম্মদেবের প্রচার উপলক্ষে হিন্দু দেবদেবীগণের বিবিধ কীর্ত্তিকলাপ বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধভাব শাস্ত্রোক্ত দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনের অতিরিক্ত চেষ্টায় একবারে উন্মুলিত হইয়াছে, আর তাহার পরিচয় পাইবার বিশেষ সুবিধা নাই। তবে প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ মুসলমান মসজিদের উপকরণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া তাহার মধ্য হইতে যেরূপ হিন্দু মন্দিরের ইষ্টকরাশি বাহির করিয়া ফেলিয়াছেন, সেইরূপ হিন্দু মন্দিরের উপকরণ অনুসন্ধান কালে বৌদ্ধমঠেরও অনেক ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করিয়া জগতে দেখাইতে পারেন।

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী।

শীতলা দেবী সম্বন্ধেও অনেকগুলি পালা প্রাচীনকালে বঙ্গভাষায় রচিত হইয়াছিল। সেই সকল গীতির নিতান্ত প্রাচীন নিদর্শন এখনও পাওয়া যায় নাই। তবে প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বের কয়েকখানি পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। ওই সকল কবির মধ্যে নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী অন্যতম। নিত্যানন্দ এই মেদিনীপুর জেলারই অধিবাসী ছিলেন। তিনি এই জেলার অন্তর্গত কাশীজোড়ার রাজা রাজনারায়ণ রায়ের সভাসদ্ ছিলেন। রাজা রাজানারায়ণ রায় ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে কাশীজোড়ার রাজগদী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

নিত্যানন্দের শীতলা মঙ্গল অতি বৃহৎ গ্রন্থ, আটটী পালায় বিভক্ত। ১ম স্থাপনা বা স্বর্গপালা; ২য় পাতল পালা—৩য় লঙ্কা পালা—৪র্থ কিষ্কিন্ধ্যা পালা—৫ম অযোধ্যা পালা—৬ষ্ঠ মথুরা ও মগধ পালা—৭ম গোকুল পালা—ও ৮ম বিরাট পালা। এই গ্রন্থে বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শীতলা দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

নিত্যানন্দের শীতলা মঙ্গলের কেবল ৭ম ও ৮ম পালা দুটি বটতলায় মুদ্রিত হইয়াছে। উহাতে প্রকাশকের এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়:—

"শীতলার জাগরণ পালা বঙ্গভাষায়।
নাহিছিল কোন দেশে সুশৃঙ্খলায়॥
অনেকের ইচ্ছা দেখে মনেতে ভাবিয়া।
উড়িষ্যা হইতে পুঁথি আনি মাঙ্গাইয়া॥
উড়িষ্যায় লিখেছিল দ্বিজ নিত্যানন্দ।
নানাবিধ কবিতায় করিয়া স্বচ্ছন্দ॥
দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্তে ব্যয় করি অর্থ।
বাঙ্গালা ভাষায় দিলাম করিয়া অর্থ॥
শিবনারায়ণ সিংহ উড়িষ্যায় নিপুণ।
গীত ছন্দে এই পুঁথি করিল রচন॥"

বিশ্বকোষ সম্পাদক প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সহিত একমত হইয়া আমরাও বলি যে প্রকাশক ওই যে কয় ছত্র লিখিয়া-

ছেন, উহার মূলে বিন্দুমাত্র সত্য আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। কবি নিত্যানন্দের আত্মপরিচয় হইতে জানা যায়;—

"কাশীজোড়া ষষ্ঠী পাড়া অতি বিচক্ষণ।
রামতুল্য রাজা তথা রাজা রাজনারায়ণ॥
নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ তাঁহার সভাসদ॥
শীতলা মঙ্গল গান রচে সুধামত॥"

তৎপরে জাগরণ পালায় কবি তাঁহার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ পীতাম্বর, বৃদ্ধ প্রপিতামহ মনোহর, প্রপিতামহ চিরজীব, পিতামহ হরিহর, পিতা রাধাকান্ত ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চৈতন্যের নাম করিয়াছেন এবং আর একটী বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন যে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ শ্রেণীর ভরদ্বাজ গোত্রে কাঁটাদিয়ার ভিঙিসাঞি বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এরূপ স্থলে তাঁহাকে কখনই উৎকল ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না; আর তিনি যে বাঙ্গালী কবি ও তাঁহার গ্রন্থ যে উৎকল হইতে আনীত হয় নাই তাহারও আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারেনা। প্রকাশক নিজের কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্যই এই কবিতাটী জুড়িয়া দিয়াছেন। কবি নিত্যানন্দের দৌহিত্র বংশ এখনও কাশীজোড়া পরগণায় বাস করিতেছেন। নিত্যানন্দ বংশীয়গণ মুসলমান রাজগণের সময় "কাজী" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

দয়ারাম দাস।

শিব, শীতলা, চণ্ডীর ন্যায় লক্ষ্মী ও সরস্বতী দেবীদ্বয়ও বহু পূর্ব্বকাল হইতে হিন্দুসমাজে পূজা পাইয়া আসিতেছেন এবং একসময়ে তাঁহাদের মাহাত্ম্য প্রচারার্থেও এদেশে অনেকগুলি মঙ্গল গান রচিত হইয়াছিল। এই সকল মঙ্গল রচয়িতাগণের মধ্যে কবি দয়ারাম দাসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দয়ারামের লক্ষ্মীচরিত্র ও সারদামঙ্গল নামক দুই খানি গ্রন্থ আছে। দয়ারামের লক্ষ্মীচরিত্রের ভাব ও ভাষা বেশ পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জ্জিত।

দয়ারামের সারদামঙ্গল সেরূপ বৃহৎ গ্রন্থ নহে। ইহা ১৭টী অধ্যায়ে বিভক্ত হইলেও শ্লোকসংখ্যা মাত্র ৫০০ শত। সাধারণতঃ সরস্বতী পূজার

দিনেই সারদামঙ্গল গীত হইত। তবে অপরাপর মঙ্গলগুলি যেরূপ মূলগ্রন্থ হইতে বৃহৎ অষ্টমঙ্গলা বা জাগরণের রূপ ধারণ করিয়াছে সারদামঙ্গলের সেরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। দয়ারাম দাসের সারদামঙ্গলই এতৎ-সম্বন্ধে প্রাপ্ত কাব্যাবলীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও প্রাচীন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন—"দয়ারামের সারদামঙ্গল গ্রন্থ ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে লালিত্য ও আবেগের অভাব নাই; পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। বিশেষতঃ সরস্বতীর মাহাত্ম্যসূচক এরূপ গ্রন্থ নিতান্ত বিরল বলিয়া এখানি সর্ব্বথা রক্ষণীয়।"

দয়ারাম মেদিনীপুর কাশীজোড়া পরগণার অন্তর্গত কিশোরচক নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম জগন্নাথ, পিতামহের নাম পরীক্ষিত, প্রপিতামহের নাম রামেন্দ্রজিৎ। কাশীজোড়ার রাজা নরনারায়ণের আশ্রয়ে থাকিয়া কবি তাঁহার কাব্যগুলি রচনা করিয়াছিলেন। কবি স্বরচিত লক্ষ্মীচরিত্রের বিনন্দ রাখালের পালায় এবং সারদামঙ্গলের নানাস্থানে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। রাজা নরনারায়ণ ১৭৪৪ খৃঃ অব্দে কাশীজোড়ার রাজাসন প্রাপ্ত হ'ন এবং ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে পরলোকগমন করেন। শীতলা মঙ্গল রচয়িতা কবি নিত্যানন্দের আশ্রয়দাতা রাজা রাজনারায়ণ ইহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র। অনুমান অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দয়ারাম মানবলীলা সম্বরণ করেন।

বঙ্গসাহিত্যের সংস্কার যুগের বিবরণে আমরা যে সকল গ্রন্থের সমালোচনা করিলাম সেই সকল গ্রন্থ ভিন্ন আমরা মেদিনীপুর জেলাবাসী আরও কয়েকজন কবির রচিত কয়েকখানি মনসা মঙ্গল, শীতলা মঙ্গল, ষষ্টীমঙ্গল, কপিলামঙ্গল, শিবরামের যুদ্ধ ও তরণী সেনের পালা নামক গ্রন্থ পাইয়াছি; কিন্তু পুঁথি বাড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া এক্ষণে আর সে সকল গ্রন্থের আলোচনা করা সুবিধাজনক বোধ করিলাম না। যাহা হউক এই যুগে মেদিনীপুরে বঙ্গসাহিত্যের কিরূপ আলোচনা হইয়াছিল তাহা দেখানই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল এবং তাহা সফল হইয়াছে মনে করিয়াই আমরা এক্ষণে সংস্কার-যুগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

কথা-সাহিত্য।

বঙ্গদেশ ধর্ম্মপ্রধান দেশ। ধর্ম্মান্দোলনের মধ্য দিয়াই এই দেশের সাহিত্যের স্ফূর্ত্তি ও বিকাশ হইয়াছে। যে যুগে যে ধর্ম্ম প্রাধান্য লাভ করিয়াছে—সাহিত্য সেই ধর্ম্মের সেবা ও পরিচর্য্যা করিয়া তাহার ভাবপুষ্টি ও প্রাধান্য সংস্থাপনের সহায়তা করিতে অগ্রসর হইয়াছে। কালের চিরন্তন নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লৌকিক ধর্ম্মের অভ্যুত্থান ও পতন সংঘটিত হইয়াছে— কোন কোন ধর্ম্মমতের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সাহিত্য সেই সেই ধর্ম্মের নিদর্শন সংরক্ষিত করিয়া অজ্ঞাতসারে নিজ অঙ্গ পরিপোষণের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। সংস্কার যুগে রচিত গ্রন্থাবলীই তাহার নিদর্শন।

বৌদ্ধধর্ম্ম এখন আমাদের দেশ হইতে একবারে বিতাড়িত হইলেও এককালে উহা যে আমাদের দেশে বিশেষরূপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল তাহার নিদর্শন বৌদ্ধ প্রাবল্যের সহস্র বৎসর পরেও বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে বিদ্যমান রহিয়াছে। আমাদের দেশের ধর্ম্মপূজা বৌদ্ধধর্ম্মেরই নামান্তর মাত্র। এই ধর্ম্ম পূজার প্রচলন হেতুই একসময় বঙ্গসাহিত্যে 'ধর্ম্মমঙ্গল' গ্রন্থের আবির্ভাব হইয়াছিল। তারপর বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিলোপ হইলে হিন্দু ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানের সময় শৈবধর্ম্মই সর্ব্বপ্রথম মস্তক উত্তোলন করে। শিবায়ন, শিব সংকীর্ত্তন প্রভৃতি গ্রন্থগুলিতে তাহারই নিদর্শন আছে। শৈব ধর্ম্মের প্রাধান্য মন্দীভূত হইলে শাক্ত-ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডী-মাহাত্ম্য-সূচক বহু গ্রন্থেরও আবির্ভাব হইয়াছিল। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টি সাধনে এই চণ্ডী দেবীই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সাহায্য করিয়াছেন। শৈব ও শাক্তের কলহে বঙ্গভাষার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। চণ্ডীর ন্যায় শীতলা, ওলা, সত্যনারায়ণ প্রভৃতি দেবদেবীগণও বঙ্গসাহিত্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। ইতর শ্রেণীর মধ্যে এই সকল লৌকিক দেবতার পূজা পদ্ধতি আবদ্ধ রহিলেও ইহাদের মাহাত্ম্য সূচক গ্রন্থেরও অভাব নাই।

এই সকল লৌকিক দেবতা—বাঙ্গালীর ঘরের দেবতা। বঙ্গ ভাষাতেই ইহাদের শাস্ত্র লিখিত ছিল এবং বঙ্গীয় গৃহস্থবধূগণই ইহাদের পূজক ছিলেন। এই সকল দেবতার ব্রতকথা প্রথমে নগণ্যভাবেই প্রথিত হইয়াছিল,। কাল সহকারে যুগে যুগে কবিগণের হস্তস্পর্শে—সেই ব্রতকথা 'গানে' ও 'গান'

বিশাল কাব্যে পরিণত হইয়াছে। প্রতিভাবান কবি শেষে যশের ভাগটী নিজেই একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতি হয় নাই। কারণ তাঁহারাও আমাদের ঘরের কবি, আর তাঁহারা যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাও আমাদেরই ঘরের ছবি। ফুল্লরা, খুল্লনা, বেহুলা, গৌরী, কালকেতু, ধনপতি, লাউসেন, চাঁদ সদাগর ইঁহারা প্রত্যেকই বঙ্গ-সংসারের এক একটী জীবন্ত ছবি।

গীতি-কবিতার যুগাবসানে বঙ্গসাহিত্যে দেশীয় পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণের এই সকল খাঁটি ছবিগুলি আমরা পাইয়াছি। এই সকল চিত্রগুলি আঁকিতে কোন কবিগুরু বাল্মিকীকে লেখনী ধারণ করিতে হয় নাই; গ্রাম্য কবিগণ বংশদণ্ডাগ্রে তুলট কাগজের উপর সেই সকল চিত্র আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন—"অকৃত্রিমতাই এই সকল কবির প্রতিভা স্বভাব ইঁহাদের হাতে খড়ি দিয়া তাঁহাদের নিজ গৃহ দেখাইয়াছিলেন, তাঁহারা নিজ বাড়ীর কথা লিখিতে গিয়া অজ্ঞাতসারে এক অমর কাব্য কথা লিখিয়া ফেলিয়াছেন।" আমাদের ঘরের কথা, আমাদের সুখ দুঃখের কথা আমাদের পল্লী-জীবনের আড়ম্বর হীন শৈশবগাথা—এককথায় আমাদের অন্তরের অতি নিগূঢ়তম, অতি প্রিয় সঙ্গীত এই সকল কবির বীণার তারে তারে বাজিয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের রচনায় একরূপ মুগ্ধকর গ্রাম্য পুষ্পের সুবাস আছে এবং কাব্যগুলির অন্তর্নিহিত একরূপ সকরুণ আর্ত্তধ্বনি আছে যাহা পড়িতে পড়িতে অনেক অতীত স্বপ্ন জাগিয়া উঠে—ও নয়নপ্রান্তে অশ্রুকণা দেখা দেয়।

বৈষ্ণব যুগের ন্যায় সংস্কার-যুগও বঙ্গ-সাহিত্যের এক গৌরবময় যুগ। মেদিনীপুরের বঙ্গ-সাহিত্যের দ্বিতীয়াবস্থা এই যুগেরই অন্তর্গত। এই যুগের যে কয়েকজন গ্রন্থকারের পবিত্র নামোচ্চারণ করিয়া আমরা ধন্য হইলাম—ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিজ বিচ্ছিন্ন মহিমায় গৌরবান্বিত হইয়া কেবল যে মেদিনীপুরের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহা নহে—তাঁহারা সমগ্র বঙ্গ-দেশের গৌরব। তাঁহাদের পবিত্র চরণরজঃ বক্ষে ধারণ করিয়া মেদিনীপুর ধন্য হইয়াছে।

কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ।

সংস্কার যুগের পর বঙ্গসাহিত্যে কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ বা নবদ্বীপের যুগ আরম্ভ। নবদ্বীপের দুইটী যুগ;—একটীর যুগাবতার সেই দেবরূপী মানুষ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, আর একটীর যুগাবতার নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। এই দুই যুগাবতারের দ্বারাই বঙ্গভাষার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গীয় সমাজের অবস্থার পরিবর্ত্তনে দুই যুগের বঙ্গভাষা দুই যুগে ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছিল। একজনের নির্ম্মল অশ্রুবিন্দু নিঃসৃত ধর্ম্ম দ্বারা উজ্জ্বল হইয়া একযুগের বঙ্গভাষা গঙ্গাধারার নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইয়াছে, আর একজনের রাজ সভার ধূর্ত্ততা, প্রতারণা ও চরিত্রহীনতার আবর্ত্তে পড়িয়া আর এক যুগের বঙ্গসাহিত্যে কুরুচি ও অশ্লীলতার পঙ্কিল স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। দ্বিতীয় যুগের সাহিত্যে প্রথম যুগের সেই সঙ্কুচিত সৌন্দর্য্য ও নিষ্কাম প্রেমের মাধুর্য্য নাই। বঙ্গভাষা এ যুগে রাজানুগৃহীতা; রাজসভার কামকলাপূর্ণ ক্রীড়ার নীল-নিচোলের অসংযত বিক্ষেপ না হইলে তাহার সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে না। আর রাজসভায় বিলাসপ্রিয় দর্শকবৃন্দের চিত্তেও উত্তপ্ত মদিরার উল্লাস প্রবাহিত হয় না। তাই আদিরসের সর্ব্বপ্রধান কবি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রই এই যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি।

ভারতচন্দ্র যে একজন প্রথম শ্রেণীর কবি এবং তিনি যে প্রকৃত কবির প্রতিভা লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠেই বলিব; তবে অলঙ্কার শাস্ত্র ও আদিরসই যে তাঁহার মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছিল একথাও কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। শব্দ চয়নে ভারতচন্দ্রের অসাধারণ ক্ষমতা; তাঁহার এক একটী কথা, এক একটী চিত্র এমন পূর্ণপ্রাণ, এমন পূর্ণ অবয়ব যে তেমনটী আমরা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কবির রচনায় দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তাঁহার এই অপূর্ব্ব শব্দ বিন্যাস দর্শন করিয়া ও তাঁহার সেই সুমধুর ছন্দের ঝঙ্কার শ্রবণ করিয়া আমাদের চক্ষু কর্ণের যথেষ্ট তৃপ্তিলাভ

হইলেও তাঁহার রচনা আমাদের মর্ম্মস্পর্শ করিতে পারে নাই। এক উচ্ছৃঙ্খল আনন্দ কোলাহলের ন্যায় উহা কেবল আমাদের মনের উপর দিয়াই ভাসিয়া যায়।

ইহার উপর ভারতচন্দ্রের সর্ব্বপ্রধান দোষ কাব্যে আদিরসের বাহুলতা। তাঁহার এ দোষ অমার্জ্জনীয়। এই দোষেই তিনি ও তাঁহার অনুকরণকারীগণ এই যুগের সাহিত্যকে ভয়ানক পঙ্কিল করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এই যুগে যতগুলি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহার দুই একখানিতে ভিন্ন নির্ম্মলভাব কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

বঙ্গসাহিত্যের যখন এইরূপ অবস্থা, রাজানুগ্রহে পুষ্ট এই গিল্টভাবী সাহিত্যের মধ্যে যখন অজস্রভাবে অবাধগতিতে অশ্লীলতার প্রখর স্রোত প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইতেছিল, সেই সময় সাহিত্যের ওই পঙ্কোদ্ধার করিতে, রাজদরবারের কলুষিত হাওয়া হইতে বহুদূরে বঙ্গের দূর পল্লীতে পল্লীতে অনেকগুলি কলকণ্ঠ কবির আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহারা পল্লীগ্রামের স্বভাব স্নিগ্ধ ছায়ায় বসিয়া সরল ভক্তি ও প্রেমাশ্রু বিধৌত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্গীত রচনা করিয়া গ্রাম্যশ্রোতার প্রাণের কামনা পরিতৃপ্ত করিতেছিলেন। সেই সকল সঙ্গীতের অধিকাংশই আবেগ ও ভাবের নির্ম্মলতায় রুচিদুষ্ট যুগ-শিক্ষাকে ধিক্কার দিয়া কালে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছে। দীনেশ বাবু সেই জন্য এই যুগের সাহিত্যকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছেন,—এক ভাগের নাম দিয়াছেন কাব্য শাখা অন্য ভাগের নাম গীতি শাখা।

বঙ্গসাহিত্যের এই কাব্য শাখার সহিত মেদিনীপুরের কোন সম্বন্ধ নাই। এই সময় মেদিনীপুর হইতে কোন সুবৃহৎ কাব্য প্রকাশিত হয় নাই বা মেদিনীপুরে কোন বড় কবিও জন্মগ্রহণ করেন নাই। তবে এই যুগে কতকগুলি গ্রাম্য কবি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্গীত রচনা করিয়া প্রসিদ্ধ লাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের ভাষা যেরূপ সুমার্জ্জিত, রুচি ও সেইরূপ সুনির্ম্মল। আমরা এই অধ্যায়ে তাঁহাদের কথাই সংক্ষেপে বলিব।

—:০:—

রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই যুগে মেদিনীপুর জেলায় যে সকল কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন আমরা তাঁহাদের সকলের নাম এবং রচনা সংগ্রহ করিতে না পারিলেও, যতগুলি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, এই অধ্যায়ে তাঁহাদের সকলের পরিচয় দিবারও যথেষ্ট স্থানাভাব। সেই জন্য এইস্থলে কয়েকজনের মাত্র নামোল্লেখ করিব। ওই সকল কবির মধ্যে রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। রমাপতির পিতা, পিতামহ প্রভৃতি এই বংশের অনেকেই সঙ্গীত রচয়িতা বলিয়া পরিচিত থাকিলেও রমাপতিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করায় অগ্রে তাহারই কথা লিখিলাম।

রমাপতি খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চন্দ্রকোণা সহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম গঙ্গাবিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতামহের নাম রামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়। রমাপতির পিতা ও পিতামহ উভয়েই উৎকৃষ্ট সঙ্গীত রচয়িতা বলিয়া তৎকালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই সঙ্গীতানুরাগই বাল্যকাল হইতে রমাপতির সঙ্গীত রচনা শিক্ষার সহায়তা করিয়াছিল। রমাপতির পিতা বেশ সঙ্গতি সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। তিনি উৎকৃষ্ট মুন্সী ও অধ্যাপক রাখিয়া পুত্রকে বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন করিয়াছিলেন। রমাপতির জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় হিজলী কাঁথির নিমক মহলে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রমাপতির শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তিনি তাঁহাকে কাঁথিতে লইয়া গিয়া উক্ত নিমক মহলে একটী কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। রমাপতি অনেকদিন কাঁথিতে চাকরী করিয়াছিলেন এবং সেই স্থানে অবস্থিতিকালে তিনি উড়িয়া ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। কাঁথি হইতে নিমক মহল উঠিয়া গেলে রমাপতিরও কাঁথির চাকরী যায়। তৎপরে তাঁহার সঙ্গীত রচনার সুখ্যাতির কথা সঙ্গীতপ্রিয় বর্দ্ধমানাধিপতির কর্ণগোচর হইলে তিনি তাঁহাকে বর্দ্ধমানে লইয়া গিয়া জমিদারী সংক্রান্ত একটী কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেন।

সে কালের 'কবি' ও 'কবির লড়াই'র কথা অনেকেই অবগত আছেন। কবি বলিলে এখন বাঙ্গালা সাহিত্যে সাধারণতঃ আমরা দুই শ্রেণীর

লোককে বুঝিয়া থাকি ; এক শ্রেণীতে কবি কৃত্তিবাসাদি আর এক শ্রেণীতে নব্য কবি সম্প্রদায়। কিন্তু এই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধভাগে 'কবি' বলিলে অন্য এক সম্প্রদায়কে বুঝাইত ; এক্ষণে তাঁহারা 'গীতকর্ত্তা' কবি নামে পরিচিত হইতেছেন। রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিধু বাবু, এণ্টুনী ফিরিঙ্গী, মুন্সী হুসেন আলি প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইঁহাদের সকলেরই এক একটী কবির দল ছিল। এক একজন কতকগুলি লোক লইয়া এক একটী দল বাঁধিতেন এবং স্বয়ং ঐ দলের নেতা হইতেন। দুইটী কবির দলে "কবি লড়াই" হইত। দুই দল গায়ক জুটিয়া ছন্দোবন্ধে পরস্পরের কথার উত্তর প্রত্যুত্তর দিতেন। সেই রচনাকেও "কবি" বলিত। তখন বঙ্গদেশের চারিদিকেই এই কবির ও কবির দলের অস্তিত্ব ছিল।

রমাপতি প্রথম বয়সে এই কবির দলের জন্য গান বাঁধিয়া দিতেন। কিন্তু তিনি নিজে জীবনে কখনও কবির দল করেন নাই বা কোন দলের বেতনভুক বাঁধনদারও থাকেন নাই। তিনি বহুসংখ্যক কবির গান ও ছড়া সহজ ও মার্জ্জিত ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেগুলি কোন পুস্তকাকারে মুদ্রিত না হওয়ায় বা পুঁথির আকারেও রক্ষিত না থাকায় অধিকাংশই নষ্ট হইয়া গিয়াছে ; মাত্র দুই চারিটী সাধারণের মুখে মুখে রহিয়া গিয়াছে।

পরবর্ত্তীকালে রমাপতি কবির দলের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় ধ্রুপদাদি অঙ্গের বৈঠকী সঙ্গীত রচনায় মনোনিবেশ করেন। এই সকল সঙ্গীত রচনা করার পর হইতেই তাঁহার যশঃ সুবিস্তৃত হইয়া পড়ে। তিনি বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট হিন্দী ও ফার্শী গানের বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং সেই সকল গানের গৎ ভাজিয়া সেই সুরে বাঙ্গালা গান রচনা করিয়াছিলেন। রমাপতি নিজেও একজন সুগায়ক ছিলেন—তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি শ্রুতিমধুর ছিল। এই কারণে তৎকালে বর্দ্ধমানের রাজপ্রাসাদ হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য গৃহস্থের বৈঠক পর্য্যন্ত সকল স্থানেই তাঁহার সমাদর হইত। রমাপতি তাঁহার রচিত সেই সকল বৈঠকী সঙ্গীতের মধ্যে কতকগুলি লইয়া "মূল সঙ্গীতাদর্শ" নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

১২৬১ সালে ঐ পুস্তকখানি মুদ্রিত হইয়াছিল। ঐ পুস্তকে তাঁহার রচিত ব্রহ্ম বিষয়ক, কৃষ্ণ বিষয়ক, শ্যামা বিষয়ক, ভবানী বিষয়ক প্রভৃতি নানা প্রকারের সঙ্গীত রহিয়াছে। আমরা এস্থলে তাঁহার রচিত বিভিন্ন প্রকারের কয়েকটী সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

ভক্তাবলী কানেড়া—কাওয়ালী।

কার বামা এল সমরে।

জলদ রূপসী, চঞ্চলা ষোড়শী, করেতে অসি, সঘনে নাদ করে।

চরণ ঝঙ্কারে সশঙ্কিত কলেবর, ভয়ে কম্পিতা মেদিনী থর থর;

পদতলে পতিত দিগম্বর, দশনে অধর ধরে॥

সমরক্ষেত্র হ'ল পবিত্র বামার শুভাগমনে;

করি মনে—ক্ষান্ত হয়ে রণে, শ্রীচরণে প্রাণ সঁপি যতনে;

অভয়া দয়া করে কিনা করে, অপাঙ্গে বামা হেরে কিনা হেরে;

সমরবেশে যদি এ বামা নাশে,

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ অন্তকালে পাই, কালে না ডরাই;

লীন হ'লে পদে, নিরাপদে রব চির সম্পদে, এ ধন কি ছার;

পলকেতে করে প্রলয় যে পশুপতি,

বামা এখন তাহারি অধিপতি;

এ বামা ভগবতী, এ বামারে কেবা মারে॥

বিভাস—একতালা।

আমার অসময় কালে ইচ্ছাময়ী যা কর।

ক্রীড়াসক্তে হ'ল বাল্যকাল হত,

যুবাকাল রস-বিলাসে বিগত,

ভয়ানক কাল নিকটাগত—

দেখে শশঙ্কিত কলেবর।

দারাসুত আদি যত পরিজন,

আত্মবন্ধু আর সুজন স্বজন,

নাহিক এখন বলিতে আপন,

স্বদেহ হতেছে ভয়ঙ্কর॥

ক্রমে হইলাম ইন্দ্রিয় দৈন্য
দেখিতেছি সকল দিক শূন্য,
গতি নাহি আর ও পদ ভিন্ন
ডাকে রমাপতি হয়ে কাতর।

মহাদেবের যোগীবেশ দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা স্মরণ করিয়া কবি ভৈরবী—ঠেকায় গাহিয়াছেন—

ছি মা কে মাধবে যোগী সাজায়েছে।
মনোহর রূপ ভস্ম কূপেতে মজায়েছে॥
চিহ্ন নাই অলকার, খসায়েছে অলঙ্কার।
নাহি জানি ভাবে কার, এ ভাব ঘটায়েছে॥
পীতাম্বর নাহি আর, বাঘাম্বর হয়েছে সার;
বাঁশী তেয়াগিয়ে, শিঙ্গা অধরে ধরায়েছে॥
নাহি সে কেয়ূর হার, গলায় রুদ্রাক্ষ তার,
চূড়া ছাড়ি শ্রীমুরারী জটাধারী হয়েছে॥
দ্বিজ রমাপতি ভাবে, বুঝি শ্যাম যোগীর ভাবে।
মান ভিক্ষা চাহি লবে মানিনী রাইর কাছে॥

রমাপতির কোন কোনও সঙ্গীতে অনুপ্রাসের বহুল ব্যবহারও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা :—

বাগেশ্রী—তাল আড়া।

এখন বাসনা করি, এখানে বাস না করি,
সমাধি হইগে শিবে।
আমার অশিবে, বিনা শিবে কেবা বিনাশিবে!
যথা উপসনাশয় তথা উপাসনা নয়,
করিয়াছি পূর্ণাশয়, লব অন্নপূর্ণাশ্রয়।
কেন থাকি নিরাহার, করি গঙ্গা নীরাহার
কালদণ্ড দুর্নিবার, অনিবার নিবারিব।
ত্যজি সংসার সং-সার, করিব সৎসঙ্গ সার
বিপদে শ্রীপদ সার, অন্য সকলি অসার;

শিব বাক্য মন দেহ, এতে কর না সন্দেহ,
রমার এ পাপদেহ, শেষে গঙ্গাতে ভাসিবে।

এই সকল সঙ্গীত ব্যতীত সাময়িক অনেক ঘটনা লইয়াও রমাপতি অনেক সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। ছোটখাট অনেক বিষয়েও তাঁহার রচিত কয়েকটী সুন্দর সুন্দর গান রহিয়াছে। আমরা এ স্থলে একটী গানের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। প্রেমরা খেলাকে লক্ষ্য করিয়া কবি বিভাস রাগিণীতে এই গানটী গাহিয়াছেন:—

প্রেমরা আমরা তোমার প্রেমে মরা,
তরিব বাল্মিকী প্রায় জপিয়া প্রেমরা মরা।
নির্জ্জনেতে চারি জনে, যখন বসি একাসনে,
তখন দেখি মনে মনে পৃথিবীরে সরা।
তেরস্তা, কোরস্তা দানে, লোভ বড় বাড়ে মনে,
দুই হাতে এক দান যদি পড়ে ধরা। ইত্যাদি

রমাপতি বাঙ্গালার ন্যায় হিন্দি সংস্কৃত ও উড়িয়া ভাষাতেও অনেক গুলি গান রচনা করিয়াছিলেন। বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। মূল সঙ্গীতাদর্শ প্রকাশিত হইবার দশ বৎসর পরে ১২৭৯ সালের ২১শে ভাদ্র তারিখে রমাপতি পরলোক গমন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এখনও চন্দ্রকোণার শত শত নরনারীর স্মৃতি পটে জীবন্ত থাকিয়া তাঁহাদের হৃদয়ের উপর রাজত্ব করিতেছেন। তাঁহার রচিত সঙ্গীতগুলি শতকণ্ঠে গীত হইয়া তাঁহার কীর্ত্তি বিঘোষিত করিতেছে। রমাপতির পিতৃ ভবন সুবৃহৎ অট্টালিকা এখনও চন্দ্রকোণায় রহিয়াছে ও বর্ষে বর্ষে তথায় শারদীয় পূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

গঙ্গাবিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়।

রমাপতির পিতা গঙ্গাবিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিতও অনেক গুলি সঙ্গীত আছে। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সঙ্গতকার বলিয়াও তৎকালে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত সঙ্গত করিবার লোভে প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিগণ সততই চন্দ্রকোণায় আগমন করিতেন। নিম্নে গঙ্গাবিষ্ণুর রচিত একটী গান প্রদত্ত হইল।

কালেংড়া—জলদ তেতালা।

এই যে যাব সে যাব আসিব সে কথার কথা
মন তুমি জান নাক জগদম্বার ক্ষমতা।
এসেছ যেমন না জান, জানিবে হবে নির্ব্বাণ
চিন্তা কর চিন্তা কথা।
ক্ষতি নাই কও তারা তারা, রসনারে কর ত্বরা,
এ কেবল কর্ম্মধরা জিজ্ঞাস যথা তথা।
সুন্দর সুতে এই কয়, ভাবিলে ভাবনা ময়
দূর কর মন ব্যথা।

রামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়।

রামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় রমাপতির পিতামহ, ভক্তি গীতির রচয়িতা বলিয়া তাঁহার প্রশংসা ছিল। রামসুন্দর নিজেও একজন সুগায়ক ছিলেন। নিম্নোদ্ধৃত গানটী তাহারই রচিত। শ্যামার করুণার আশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়া উৎসাহপূর্ণ অন্তরে কবি এই গানটী গাহিয়াছেন।

কালেংড়া—মূল।

যাওয়া হবেনা কেনরে ও মন ভবনদীপারে।
নিস্তার কারিনী শ্যামা ভাবরে অন্তরে॥
ভবনীরে তনুতরী, ভাসাওরে মন ত্বরা করি।
বসে থাক তদুপরি জ্ঞান হালি ধরে॥
শ্রদ্ধা ভক্তি সুবাতাসে তরণীধর, কুমতি কুটিল কুবাতাস পরিহর;
ছজন দাঁড়ি কি কাজ বল, দুর্গা নামে বাদাম তোল,
হলো সুগম চল ভক্তি পবন ভরে॥
এখন হতে তোমায় রে মন বলে রাখি শুন,
কাল চড়া আছে, তরী না ঠেকে তায় যেন,
জ্ঞান হালি ধর জোরে, দুর্গানাম পালি ভরে,
লয়ে চল এ সুন্দরে চিন্তামণিপুরে।

করুণাময়ী দেবী।

রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নীর নাম করুণাময়ী দেবী। করুণাময়ীও সঙ্গীত রচনায় নিপুণা ছিলেন। করুণাময়ীর পিতা শাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কন্যাকে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা দিয়াছিলেন। স্বামীর ন্যায় তাঁহার হৃদয়ও কবিত্বপূর্ণ ছিল এবং তাঁহার যোগে রমাপতির কবি জীবনের স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল। শুনা যায় প্রেমিক দম্পতি একত্রে একই সুরে সঙ্গীত রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া অল্প সময়ের মধ্যে মনোরম গীত প্রণয়ন করিতেন। এইরূপে বহুসংখ্যক গীতযুগল রচিত হইয়া এখনও তাঁহাদের পবিত্র দাম্পত্য প্রেমের কথা এদেশে প্রচার করিতেছে। নিম্নে উদাহরণ স্বরূপ ঐরূপ চারিটী গান উদ্ধৃত হইল।

শ্রীরাধা বেশভূষায় বিভূষিতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন, রজনী প্রভাতোন্মুখ, শ্যাম সমাগমের আশা রাধিকার হৃদয়ে ক্রমেই বিলুপ্ত হইতেছে। রমাপতি রাধিকার মুখে সেই অবস্থা বর্ণন করিয়া বেহাগ এক তালায় গাহিয়াছেন,—

সখি শ্যাম না এল,
অবশ অঙ্গ শিথিল কবরী,
বুঝি বিভাবরী অমনি পোহাল।
সর্ব্বরী ভূষণ খদ্যোতিকা তারা,
ঐ দেখ সখি আভাহীন তারা
নীলকান্তমণি হলো জ্যোতি হারা—
তাম্বূলের রাগ অধরে মিশাল।
ঐ দেখ সখি শশাঙ্ক কিরণ,
ঊষার প্রভায় হলো সঙ্কীরণ,
সঘনে বহিছে প্রাতঃ সমীরণ
কুসুমের হার শুকাল—

শিখি সুখে রব করিছে শাখায়
পুলকিত হেরি অভ্র সভায়,
পতির বিচ্ছেদে উন্মাদিনী প্রায়
কুমুদিনী হাস্য বদন লুকাল।
বিহঙ্গমগণ করে উদ্বোধন,
বন্ধু দরশনে চিত্ত বিনোদন
আমার কপালে বিরহ বেদন
বুঝি বিধি ঘটাল।
তাপিত হৃদয় রমাপতি কয়
এ বিরহ রাই তোমা বলে নয়।
দেখ বৃক্ষচয় হলো অরুণময়,
সর্ব্বরীর সুখ বিলাস ফুরাল।

কোমল-হৃদয়া করুণাময়ী বিরহ-বিধুরা রাধিকার এই বিসদৃশ অবস্থা সহ্য করিতে না পারিয়াই যেন শ্যামের শুভাগমন সংবাদে রাধিকাকে উল্লসিত

করিবার অভিপ্রায়ে সেই সুরেই গাহিয়াছেন :—

সখি শ্যাম আইল,
নিকুঞ্জ পুরিল মধুপ ঝঙ্কারে,
কোকিলের স্বরে গগন ছাইল।
সুলক্ষণ চিহ্ন নাচিছে বামাঙ্গ,
স্পন্দন করিছে আনন্দে অপাঙ্গ,
পুলকিত রবে ডাকিছে বিহঙ্গ,
কুরঙ্গ কুরঙ্গী আনন্দে মাতিল
মলয় অনিল প্রলয় রহিত,
বিরহ বিলয় প্রলয় সহিত
সহসা অহিত হইতে রহিত
তারে কে শিখালে।

এই হ'তেছিল চাতকের ধ্বনি,
'জল দে' 'জল দে' বলিয়া অগনি,
আজি বুঝি তার দুঃখের রজনী,
সজনী পোহাল।
ফলিল তাহার আশা তরুবর,
হেরিয়ে নবীন নীল জলধর,
আশাংশু চকোর শুধাংশু কিঙ্কর
বিধিকৃত কালে বিধুরে পাইল।
ব্যথিতা করুণা সকরুণে কয়
নিশান্তরে রাই প্রভাত নিশ্চয়
তাই দুঃখান্তে সুখের উদয়
বিয়োগ নিশির ভোগ ফুরাল।

নিশিথ রজনীতে বেহাগ রাগিনী তাল আড়ায় দেহ ধারণ ও দেহত্যাগ সম্বন্ধে জীবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দুইটি গান রচিত হইয়াছিল। করুণাময়ীর লক্ষ্য নবজাত শিশু—রমাপতির লক্ষ্য মৃতদেহ। করুণাময়ী গাহিয়াছেন :—

কোথা হ'তে এলে তুমি, কেবা কোথাকার হে।
বল কোন্ খানে হবে, গমন তোমার হে॥
কাহারো কর্ম্ম সাধনে, কিম্বা স্বীয় প্রয়োজনে।
এলে নব ভুবনে, কোয়ে স্বেচ্ছাচার হে॥

কেন বা এ কর্ম্মক্ষেত্রে, তুমি পদার্পণ মাত্রে।
রোদন সলিল-নেত্রে, করিলে সঞ্চার হে॥
হেন অনুমানি মনে, ছিলে যার অবলম্বনে।
অকস্মাৎ সেই ধনে, হেরে শূন্যকার হে॥

হও কোন ধর্ম্মাসীন, সংসারী কি উদাসীন।
কত হে মমতাধীন, সঙ্গি আপনার হে॥
তোমার কে আছে বিভু, কিম্বা তুমি কার প্রভু।
হেরিয়াছ এ ভূ কভু অথবা সংসার হে॥

কি জাতি, কি ধর নাম, কোথা পরিণাম ধাম।
কি ভাবিছ অবিশ্রাম, কহ তথ্য তার হে।
লহ করুণার মর্ম্ম, না করিহ হেন কর্ম্ম।
যাহে ইহ পরধর্ম্ম, যায় আপনার হে।

রমাপতিও সেই সুরে গাহিয়াছেন :—

কোথায় কর গমন, ওহে মৌনব্রত জন।
বল দেখি নাহি দেহ সাধিলে উত্তর কেন॥
হেন হয় অনুভূত— তব বশীভূত ভূত।
করি তোমায় অভিভূত হরিল শ্রীধন॥

কোথায় তুরঙ্গ পদ, তব গমন আস্পদ।
করী কর বিহনেতে স্বজন বাহন॥
কারে দিলে রাজকর্ম্ম, কে লইল অসি বর্ম্ম।
অমাত্যাদি তেয়াগিয়ে কেন হে নির্জ্জন॥

ছিলে যবে সিংহাসনে গঞ্জ ছিলে সিংহসনে।
এখন অগত্যা সার হলো তৃণাসন॥
যাত্রাতে মঙ্গলাচার, ছিল পূর্ণঘট যার।
এ শূন্য ঘটেতে তার ঘটে কি তেমন॥

চলিয়াছ মাভৈ রবে, ত্যজি অতুল বৈভবে।
করেছ যার কৈতবে বহু পর্য্যটন॥
কহে রমাপতি দীন, এ নিধন তাঁর অধীন।
আছে যাঁর ইচ্ছাধীন সৃজন পালন॥

করুণাময়ী দেবীর হৃদয় যথেষ্ট উন্নত ছিল। যাহাতে দেশের চারিদিকে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচার ও স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধিত হয়—তদ্বিষয়ে তিনি বিশেষ যত্নবতী ছিলেন। তিনি বহুবর্ষ যাবৎ বর্দ্ধমানের বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী থাকিয়া বহু বালিকার সুশিক্ষার বিধান করিয়াছিলেন। ১২৯১ সালের ১৫ই ভাদ্র করুণাময়ী পরলোকগতা হইয়াছেন।

তারিণী দেবী।

করুণাময়ীর ন্যায় তারিণী দেবীও মেদিনীপুর জেলার একটী স্ত্রী-কবি। ভারতের রমণীরা যে শুধু সতীত্বে পাতিব্রত্যে অতুলনীয়া ও চিরস্মরণীয়া তাহা নহে। বিদ্যাবত্তাতেও তাঁহারা পরম কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। বৈদিক অথবা পৌরাণিক যুগের বিশ্ববারা, অপালা, অদিতি, ঘোষা, মৈত্রেয়ী, গার্গী, দেবহুতি, আত্রেয়ী প্রভৃতির কথা ছাড়িয়া দিলেও তাঁহাদের পরবর্ত্তী যুগে ভারতে বিদুষীর অভাব ছিল না। আমাদের এই বাঙ্গালা দেশেই অনেক বিদুষীর পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বৈষ্ণব যুগের রামমণি, মাধবী ও রসময়ী প্রভৃতি কবিতা রচনায় অক্ষয় যশলাভ করিয়াছেন। এই কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগেও বৈজয়ন্তী, প্রিয়ম্বদা ও সুন্দরী দেবী সংস্কৃত রচনায় এবং আনন্দময়ী, গঙ্গামণি ও যজ্ঞেশ্বরী বাঙ্গালা কাব্য ও সঙ্গীত রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ইঁহাদের সকলের নিবাস পূর্ব্ববঙ্গ। পশ্চিম-বঙ্গের আমাদের এই তারিণী দেবীও এই কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের অন্যতম রত্ন। দীনেশ বাবু তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে আনন্দময়ী, গঙ্গামণি ও যজ্ঞেশ্বরীর কবিতার পরিচয় দিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গনিবাসী লেখক পশ্চিম বঙ্গের এই স্ত্রীকবিটীর বিষয় বোধ হয় অবগত ছিলেন না বলিয়াই তাঁহার গ্রন্থে ইহার নামোল্লেখ করেন নাই। তারিণী দেবীর রচনা কোন অংশেই যজ্ঞেশ্বরীর অথবা গঙ্গামণির রচনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। তারিণী দেবীর রচিত প্রায় তিন চারিশত সঙ্গীত রহিয়াছে।

তারিণী করুণাময়ীর অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী কবি। ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত বরদা পরগণার এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তারিণী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি সাধারণতঃ তারিণী ব্রাহ্মণী নামেই পরিচিত। গানের ভণিতাতেও এ নাম দৃষ্ট হয়। একটী সঙ্গীত এস্থলে প্রদত্ত হইল।

শিব দুর্গা নাম লওনা কেন মনরে আমার।
অন্তিমকালে তরাইবে ভবনদী পার॥
দুর্গা নামটী মকরন্দ, শ্রবণে বহে আনন্দ।
নিরানন্দ নিতান্ত, কপাল মন্দ যার॥

দুর্গা নামটী মহৌষধি, পান কর নিরবধি।
কালো ভয় কালো চিন্তে নাইক তোমার॥
তারিণী ব্রাহ্মণী বলে দুর্গা নামটী না লইলে।
শমন ভুবনে গেলে দোহাই দিবে কার॥

কৈলাসেশ্বর বসু।

কবি কৈলাসেশ্বর বসু বাঙ্গালা ১২০৩ সালে এই জেলার অন্তর্গত পিঙ্গলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম বারাণসী বসু; তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী কালে নাটোর রাজ পক্ষ হইতে ইংরাজ দরবারে উকীল নিযুক্ত ছিলেন। কৈলাসেশ্বর ১২৫৫ সালে "মহাভাগবতের" ও ১২৭০ সালে "অদ্ভুত রামায়ণের" পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বহুসংখ্যক কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। "ভবের খেলা সাঙ্গ হল" শীর্ষক প্রসিদ্ধ গানটী তাঁহারই রচিত। কবি কৈলাসেশ্বরের "প্রণতি পুষ্পাঞ্জলী" নামক একখানি পুস্তক আছে। মাত্র এই পুস্তকখানি তাঁহার বংশধরগণ কর্তৃক মুদ্রিত হইয়াছিল। অন্যান্য রচনার অধিকাংশই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ১৯১০ খৃঃ অব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের এক মাসিক অধিবেশনে সুলেখক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তোফি মহাশয় এই কবির সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটী পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে জানা যায় যে তাঁহার রচিত মহাভাগবত ও অদ্ভুত রামায়ণের পদ্যানুবাদের এবং অন্যান্য কবিতা ও সঙ্গীতগুলির যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা এক্ষণে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ১২৯২ সালে কৈলাসেশ্বরের পরলোক প্রাপ্তি হয়।

রামনারায়ণ ভাট।

আমরা ইতিপূর্ব্বে এই অধ্যায়ে যে সকল কবির নামোল্লেখ করিয়াছি ইঁহারা সকলেই বিদ্যাবিষয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু এই সকল কবি ব্যতীত এই জেলায় কয়েকটী নিরক্ষর কবিও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ সামান্য মাত্র বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে জানিতেন, কেহ বা একবারেই কিছু জানিতেন না। কিন্তু তাঁহারা যে সকল গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল গীতের শব্দ বিন্যাস দেখিলে বিদ্বান্ লোকের

রচনা বলিয়াই প্রতীতি হয়। তাঁহারা যে কেবল উৎকৃষ্ট শব্দ বিন্যাস করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা নহে। স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট উপমা ও অনুপ্রাসের ভূয়সী ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। রামনারায়ণ ভাট ঐরূপ একজন কবি ছিলেন। এই জেলার অন্তর্গত ঘাটাল মহকুমার অন্তর্বর্ত্তী ক্ষীরপাই গ্রামে তাঁহার জন্মভূমি। রামনারায়ণ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মুখে মুখে অতি সুন্দর সুন্দর কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার ঐরূপ অলৌকিক শক্তি থাকায় তৎকালে সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিত। রামনারায়ণের রচিত অনেকগুলি সঙ্গীত রহিয়াছে।

নবীন বাউল।

নবীন বাউল জাতিতে নমঃশূদ্র ছিলেন। মেদিনীপুর সহরের অন্তর্গত হবিবপুর পল্লীতে তাঁহার জন্মভূমি। মেদিনীপুরের বাউল সম্প্রদায়ের ইনিই নেতা ছিলেন। উৎকৃষ্ট ভক্তিগীতি রচয়িতা বলিয়া ইঁহার খ্যাতি ছিল। মেদিনীপুরের বৈষ্ণবগণ এখনও তাঁহার রচিত সঙ্গীতগুলি গান করিয়া থাকে। নবীন বাউলের রচিত অনেকগুলি সাময়িক সঙ্গীতও রহিয়াছে। Palmer ও Kimber নামক দুইজন প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনীয়ার কর্ত্তৃক মেদিনীপুরের কংসাবতী নদীর এ্যানিকেটটী নির্ম্মিত হয়। নবীনের রচিত—

"নদী বাঁধল ইংরাজ বাহাদুরে—
পামর কিমর সুজন এসে রাখল খ্যাতি সংসারে।"

ইত্যাদি পংক্তি যুক্ত গানটী যে আজও মেদিনীপুরের রাখাল বালকগণ আনন্দের সহিত গাহিতে গাহিতে গরু চরাইতে থাকে, উহা ঐ নবীন বাউলেরই রচিত।

১৮৫১ খৃঃ অব্দে রাজনারায়ণ বসু মহাশয় যখন মেদিনীপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইয়া আসেন, তখন নবীন বাউল জীবিত ছিলেন। কবির তখন বৃদ্ধাবস্থা। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বাবু ইঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। কবির বাড়ীর প্রাঙ্গনে একটী বাঁধান বকুল গাছ ছিল। রাজনারায়ণ বাবু প্রায় প্রতিদিন বৈকালে তথায় বসিয়া নবীনের ভক্তি সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন। প্রায় ৪০।৪৫ বৎসর হইল নবীন পরলোক গমন করিয়াছেন।

জগন্নাথ দাস।

'কবি' ও 'কবির লড়াইর' কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। জগন্নাথ দাস এই জেলার একজন প্রসিদ্ধ কবি সঙ্গীত রচয়িতা। তিনি সাধারণতঃ জগা দাস বা জগা বেণে নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার রচিত অনেকগুলি কবি-সঙ্গীত রহিয়াছে; বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না। জগন্নাথ দাস বাগবাজার নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ কবি সঙ্গীত রচয়িতা ভোলা ময়রার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

অন্যান্য কবিগণ।

এই যুগে কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, সুপ্রসিদ্ধ মহারাজা নন্দকুমার, ভূকৈলাসের মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল, নাটোরাধিপতি রাজা রামকৃষ্ণ, পাকুড়ের রাজা পৃথ্বীচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গদেশের কয়েকজন রাজা মহারাজাও অনেক গান রচনা করিয়াছিলেন। মেদিনীপুর জেলা-নিবাসী নাড়াজোলাধিপতি রাজা মহেন্দ্রলাল খান বাহাদুরও অনেকগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার রচিত "সঙ্গীত লহরী", "মান-মিলন" "গোবিন্দ-গীতিকা", "মথুরা মিলন", "শারদোৎসব" নামক পাঁচখানি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। খেজুরী থানার অন্তর্গত কশাড়িয়া গ্রাম-নিবাসী স্বর্গীয় পুরন্দর মণ্ডলও একজন উৎকৃষ্ট সঙ্গীত রচয়িতা ছিলেন। ব্রহ্মজামলের বঙ্গানুবাদক মালঞ্চ গ্রাম-নিবাসী স্বর্গীয় জয়গোবিন্দ দের রচিতও কয়েকটী সঙ্গীত রহিয়াছে। কিন্তু এই সকল কবির রচনায় প্রাচীন যুগ অপেক্ষা বর্ত্তমান যুগের প্রভাবই বেশীমাত্রায় পরিলক্ষিত হওয়ায় এস্থলে কেবল তাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়াই নিবৃত্ত হইলাম।

এ অধ্যায়ে আমরা যে যুগের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম—রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের অভ্যুদয়েই সেই যুগের আরম্ভ এবং কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যুতেই সেই যুগের শেষ। ঈশ্বরচন্দ্রই পুরাতন দলের শেষ কবি;—তারপর নবযুগের প্রথম কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের অভ্যুদয়। নবযুগের পদ্য-সাহিত্যের আলোচনা করিবার এ প্রবন্ধে যথেষ্ট স্থানাভাব। সেই জন্য ভিন্ন প্রবন্ধে বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান যুগের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ লিখিবার ইচ্ছা রাখিয়া এইখানে প্রাচীন যুগের পদ্য-সাহিত্যের আলোচনা শেষ করিলাম।

গীতি-সাহিত্য।

কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের বঙ্গসাহিত্যের আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে এই যুগে কাব্য অপেক্ষা গীতিই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দর", বা "অন্নদা মঙ্গল," রামগতি সেনের "মায়া-তিমির চন্দ্রিকা," দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের "গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিনী প্রভৃতি এই যুগের সুপ্রসিদ্ধ কাব্যগুলি এক শ্রেণীর পাঠকগণের নিকট আদৃত হইলেও অধিকাংশের নিকটেই রামপ্রসাদ, রাম বসু,—দাশরথী প্রভৃতি সঙ্গীতকারগণই বিশেষ ভাবে সম্মানিত হইয়াছেন এবং এখনও হইতেছেন। ভক্তমণ্ডলীর সংখ্যাধিক্য দেখিয়া যদি ভক্তর গুণপণার পরিমাণ নির্ণয় করিতে যাওয়া যায় তাহা হইলে এই যুগের সঙ্গীতকারগণকেই কাব্য রচয়িতাগণের অপেক্ষা উচ্চ স্থান দিতে হইবে। নিরক্ষর কৃষক হইতে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলী পর্য্যন্ত সকলেই এই সঙ্গীতকারগণের ভক্ত।

আমাদের দেশ ভক্তি প্রধান দেশ; এদেশে কর্ম্ম অপেক্ষা ভক্তিই অধিক কার্য্যকরী এবং এই ভক্তি কাব্য অপেক্ষা সঙ্গীতেই সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়াই বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের এত গৌরব এবং রামপ্রসাদের সঙ্গীতের ও দাশরথীর পাঁচালীর এত আদর। কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের গীতি-সাহিত্য বৈষ্ণব যুগের পদাবলী সাহিত্যেরই অন্য সংস্করণ—হৃদয়ের আর এক দিকের চিত্র।

এক্ষণে গীতি-কাব্য বলিয়া যে একশ্রেণীর কাব্য আমাদের দেশে বিশেষ ভাবে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে—পূর্ব্বোক্ত গীতি সাহিত্যই তাহার মূল। এই সাহিত্যে বর্ত্তমান যুগের গীতি-কাব্যের মুখ্য চিহ্নগুলি বিদ্যমান থাকায় এই গীতি-সাহিত্যকেই বর্ত্তমান যুগের গীতি কাব্যের পথ প্রদর্শক বলা যাইতে পারে। বঙ্গীয় পদ্য-সাহিত্যে এক্ষণে এই গীতি কবিতারই যুগ চলিতেছে। কবিকুলরবি রবীন্দ্রনাথ এক্ষণে এই যুগের পরিচালক। রবীন্দ্রনাথের প্রভাময়ী প্রতিভা আজ সমস্ত জগত আলোকিত করিয়াছে। তাঁহার লেখনী নিঃসৃত সুধাপানে আজ শুধু বঙ্গবাসী বা ভারতবাসী নয়, সমস্ত জগতবাসীই বিভোর।

গদ্য-সাহিত্য।

নবযুগের পূর্ব্বাভাষ।

বঙ্গসাহিত্যের সহিত মেদিনীপুরের সম্বন্ধ দেখাইতে গিয়া আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে কেবল প্রাচীন পদ্য-সাহিত্যেরই আলোচনা করিয়াছি, বর্ত্তমান অধ্যায়ে আমরা গদ্য সাহিত্যের সহিত মেদিনীপুরের যেটুকু সম্বন্ধ আছে তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

বাঙ্গালা গদ্য রচনা প্রথা কোন সময়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা এ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। তবে ইহা নিশ্চিত যে আমাদের মাতৃভাষা গদ্যময়ী কথিত ভাষার আকারেই জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী যুগে লিপি-প্রণালী উদ্ভাবিত হইলে পর ক্রমে শিক্ষা ও চিন্তার উৎকর্ষতার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গভাষায় পদ্য রচনার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য রচনা অতি প্রাচীন হইলেও ইহার প্রাচীনতার দৃষ্টান্ত বড়ই বিরল। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে রমাই পণ্ডিতের রচিত 'শূন্য পুরাণ' নামক যে পদ্য পুঁথিখানি আবিষ্কৃত হইয়াছে উহার মধ্যে স্থানে স্থানে গদ্য-রচনাও আছে। ওই রচনার অনেক শব্দই প্রাদেশিক, সুতরাং তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম না হইলেও আপাততঃ উহাকেই বাঙ্গালা সাহিত্যের গদ্য-রচনার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে। ওই গদ্যের নমুনা এইরূপ:—

"পশ্চিম দুয়ারে কে পণ্ডিত। সেতাই যে চারিসাএ গতি আনি লেখ্যা। চন্দ্র কটাল জে জে বণুয়া ঘটদাসী ভুত নাহি তরায় তুমাকে দেখিয়া চিত্রগুপ্ত পাঁজির পরিমাণ করে"

রমাই পণ্ডিতের পরে খৃষ্টীয় একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যে আর কোন লেখক বাঙ্গালা গদ্যের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। ইহার পরে পঞ্চদশ শতাব্দীতে লিখিত "চৈতন্যরূপ প্রাপ্তি" নামক চণ্ডীদাসের একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। এই পুস্তকখানি যদিও গদ্যে লিখিত কিন্তু স্বর্গীয় পণ্ডিত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়ও এই গদ্য রচনাকে পদ্যেরই এক-

প্রকার রূপভেদ বলিয়া লিখিয়াছেন। নমুনা এইরূপ :—

"চৈতন্যরূপ রা চ অধরূপ লাড়ি। রা অক্ষরে রাগ লাড়ি। চ অক্ষরে চেতনা লাড়ি। র এতে চ মিশিল। রানত রসিল। ইবে এক অঙ্গা লাড়ি।"

খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রেমে মাতোয়ারা বৈষ্ণব কবিগণের ললিত ঝঙ্কারে বঙ্গের কবিকুঞ্জ মুখরিত হইয়া উঠে। কিন্তু তাঁহারা যে সকল প্রেমাশ্রুসিক্ত পবিত্র পদাবলীর অপূর্ব্ব মালিকা বঙ্গভারতীর কণ্ঠে তুলিয়া দিয়াছেন তাহার তুলনায় তাঁহাদের গদ্য রচনা সামান্য মাত্র।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলমান শাসনের তিরোভাব ও ইংরেজ শাসনের সূচনা হয়। বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যও এই বিপ্লব-সন্ধি যুগে এক অদ্ভুত প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। এই যুগে বাঙ্গালার সহিত রাজদরবারের উর্দ্দু ও টোলের সংস্কৃত মিশিয়া একরূপ বিকৃত বাঙ্গালার সৃষ্টি করে। তাহার ফলে বাঙ্গালী বাঙ্গালা লিখিতে বসিয়া "আপন আপন রাজি রুকবতে স্বইচ্ছা পূর্ব্বক সাবুদ আক্কেলে বহাল তবিয়তে বিক্রয় করিলাম" লিখিয়া মাতৃ ভাষার বিপুল শব্দ সম্পদের নিদর্শন প্রদর্শন করিতে থাকেন।

একদিকে যখন রাজদরবারের পার্শিনবিস মহাত্মারা এইরূপ উর্দ্দু মিশ্রিত ভাষায় বাঙ্গালা লিখিয়া বাঙ্গালা ভাষায় পিতৃশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিতেছিলেন তখন অন্যদিকে চতুষ্পাঠীর প্রাঙ্গণে বসিয়া সংস্কৃতজ্ঞ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের ঝোঁকে বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে সংস্কৃতের "গৌড়ীয় রীতি" প্রবেশ করাইয়া বাঙ্গালা ভাষার মাতৃশ্রাদ্ধেরও ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। এই রীতির প্রধান লক্ষণ ছিল কেবল মনোগত অর্থকে অনর্থক শব্দ সাহায্যে প্রপীড়িত ও দুর্ব্বোধ্য করিয়া প্রকাশ করা। ইহার উপর ঐ সকল পণ্ডিতগণ তাঁহাদের রচনার মধ্যে যথেচ্ছা অনুপ্রাস ও সমাসের ছড়াছড়ি করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে এরূপ দুর্ব্বোধ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন যে বাঙ্গালী ঐ সকল পণ্ডিতি রচনার উৎকট প্রহেলিকা ভেদ করিতে না পারিয়া ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার গদ্য সাহিত্য ঐরূপ সংস্কৃত ও মুসলমানী শব্দের বিপুল ভারে নিষ্পেষিত হইতে থাকে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের গতি ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করে। ১৮০০ খৃঃ অব্দে লর্ড ওয়েলেসলী ভারত প্রবাসী ইংরাজদিগের বাঙ্গালা শিক্ষার জন্য কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন। তৎকালে বিলাত হইতে যে সকল সিভিলিয়ান ভারতে চাকুরী করিতে আসিতেন তাঁহাদিগকে এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পণ্ডিত ও মৌলবীদিগের নিকট বাঙ্গালা, হিন্দি, উর্দ্দু ও পার্শী শিখিতে হইত। এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেই খ্যাতনামা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইতযুগ-সম্মত ভবিষ্যৎ গৌরবের সূত্রপাত হয়। এই জন্য এই কলেজের নাম বাঙ্গালীর হৃদয়ে চির-জাগরূক থাকিবে। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চির-স্মরণীয় যোগ্যতার অন্য গুরুতর কারণ আছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজই বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের পুষ্টিকল্পে প্রধানতম সহায়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বর্ষে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসাহিত্য ও ভাষার নব আশা পূর্ণ জীবন আরম্ভ হইয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে সকল গদ্য গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল, মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে এবং গদ্য লেখার প্রতি লোকের অনাদর প্রযুক্ত সে সকলের অস্তিত্বের বিষয় অতি অল্প লোকেই জানিতেন এবং যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারাও গদ্যকে বড় একটা স্নেহের চক্ষে দেখিতেন না। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে পর সিভিলিয়ানদিগের শিক্ষার জন্য বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থ সকল গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে প্রথমে বিলাত হইতে এবং তৎপরে এদেশে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত করিয়া মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইলে একদিকে যেমন সাধারণের দৃষ্টি এই গদ্য সাহিত্যের দিকে পতিত হইল তেমনই অন্যদিকে কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণও কলেজের ছাত্রদিগের জন্য উচ্চ স্তরের পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল।

এই যুগে যে সকল মহাত্মা বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে রাজীবলোচন রায় মুখোপাধ্যায়, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার, রাজা রামমোহন রায়, রাজা রাধাকান্ত

দেব, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল লেখক ব্যাকরণ, অভিধান, নীতিগ্রন্থ, চরিত কথা, ইতিহাস, ভূগোল, খগোল, পদার্থ-বিদ্যা, ব্যবস্থা-শাস্ত্র, সন্দর্ভ সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়া বঙ্গভাষার শক্তি ও জ্ঞানভাব সম্পত্তির বৃদ্ধি বিধান করিয়া বাঙ্গালী জাতির সমক্ষে তাঁহাদের মাতৃভাষার অপরিহার্য্যতা প্রতিপন্ন করেন। উহার গতিকে জাতি মধ্যে যে অভিনব প্রাণস্পন্দন জাগিয়াছিল নব-বঙ্গ-সাহিত্যের জনক পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাহার ঘনীভূত আবর্ত্ত। এই সকল লেখক সম্প্রদায় ন্যূনাধিক ইউরোপীয় ও খাঁটি দেশীয় ভাব-ধারার সম্মিলন স্থান। আজ তাঁহাদের কীর্ত্তিরাশির উপর কালের প্রাথমিক পলি মৃত্তিকা পতিত হইয়া তাঁহাদের স্পষ্ট প্রভাব অদৃশ্য করিয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু বহু শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট এ নব-বঙ্গ-সাহিত্য-পাদপের আভ্যন্তরীণ প্রাণতত্ত্ব এবং উহার মূল শিকড় তাঁহাদের মধ্যেই নিহিত আছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ ভাগ হইতে বঙ্গসাহিত্যে যে যুগের আবির্ভাব হইয়াছে তাহার আভাব উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বর্ষ ১৮০০ খৃঃ অব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা হইতে ঐ অব্দের প্রথমার্দ্ধ ভাগের শেষ বৎসর ১৮৫০ খৃঃ অব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কার্য্য ত্যাগ পর্য্যন্ত এই অর্দ্ধ শতাব্দীর সাহিত্য আলোচনা করিলেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে। এই পঞ্চাশ বৎসর কালকেই নব-বঙ্গ সাহিত্যের ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত বলা যাইতে পারে। "পূর্ব্বাপরের ও নূতন পুরাতনের অস্পষ্ট ছায়া-মিলনময় এই মুহূর্ত্ত। ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তের স্পষ্ট জাগ্রত অথচ আত্মস্থ কর্ম্মযোগই এই অর্দ্ধ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস।"

মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার।

বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ উপাসক ও বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমালোচক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহোদয় "বঙ্গভাষার লেখক" নামক গ্রন্থে তাঁহার পিতৃদেবের জীবনী প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"শ্রীগৌরাঙ্গের পর হইতে বাঙ্গালায় একপ্রকার খুচরা পদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। খুচরা বলিয়া তাহাকে 'কড়চা,'

হলে। সেইগুলি ছাড়িয়া দিলে, প্রথম গদ্য লেখক রাজীবলোচন রায়।...
দ্বিতীয় গদ্য গ্রন্থকার রামরাম বসু।...তৃতীয় গ্রন্থকার মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার।"
অক্ষয় বাবু এই মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারকেই নবাঙ্কুরিত বঙ্গ গদ্য সাহিত্যের
একজন 'প্রথম পথ-প্রদর্শক' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মেদিনীপুরের
সৌভাগ্য যে এই মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারও মেদিনীপুর জেলার অধিবাসী।

মৃত্যুঞ্জয় ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। মেদিনীপুর জেলার যে অংশে তাঁহার নিবাস ছিল, উহা তৎকালে উৎকল প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত থাকায় কেহ কেহ তাঁহাকে উৎকল দেশ নিবাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মৃত্যুঞ্জয় কিন্তু রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ; খানের চাটুতি, শ্রীকরের সন্তান। তিনি নাটোর রাজের সভা-পণ্ডিতের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া তৎকালে বঙ্গদেশের মধ্যে একজন প্রধান পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হ'ন। ১৮০০ খৃঃ অব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে মৃত্যুঞ্জয় সেই কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে প্রতিষ্ঠিত হ'ন। পরে কিছুদিন কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের জজ-পণ্ডিতের কার্য্যও করিয়াছিলেন। তৎকালে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার উপযোগী কোন পুস্তক নাই দেখিয়া কলেজের ছাত্রগণের অধ্যয়নার্থ মৃত্যুঞ্জয় 'বত্রিশ সিংহাসন', 'পুরুষ-পরীক্ষা', 'রাজাবলী' ও 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা' নামক চারিখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থগুলি গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ে বিলাত হইতে কাঠের অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া আসিত এবং উহাদের আবরণী-পত্রে লেখা থাকিত—"লন্ডন মহানগরে ছাপা।" এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া বাঙ্গালা অনভিজ্ঞ সিবিলিয়ান, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও কলেজের অন্যান্য ছাত্রগণ বাঙ্গালা ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতেন।

মৃত্যুঞ্জয়ের লিখিত প্রথম গ্রন্থ "বত্রিশ সিংহাসন"— হিন্দী বত্রিশ সিংহাসনের অনুবাদ। ১৮০১ খৃঃ অব্দে এই পুস্তক অনূদিত হয় এবং শ্রীরামপুর মুদ্রাযন্ত্রে প্রথমে মুদ্রিত হয়। পরে যথাক্রমে ১৮১৬ ও ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে লন্ডন মহানগর হইতে ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ ছাপা হইয়া আসে। ১৮০৮ খৃঃ অব্দে মৃত্যুঞ্জয়ের "পুরুষ পরীক্ষা" ও "রাজাবলী" নামক গ্রন্থ দুইখানি প্রকাশিত হয়। পুরুষ পরীক্ষা সংস্কৃত পুরুষ পরীক্ষা গ্রন্থের

অনুবাদ। ইহাতে পুরুষের বিবিধ গুণের কথা উপন্যাসের আকারে বর্ণিত হইয়াছে। "রাজাবলী"তে সূর্য্যবংশের প্রথম রাজা ইক্ষ্বাকু হইতে কোম্পানীর শাসনকাল পর্য্যন্ত সময়ের অনেক রাজা ও সম্রাটের নাম এবং শাসন সময়ের কথা বিবৃত আছে।

মৃত্যুঞ্জয়ের এই তিনখানি গ্রন্থের ভাষা যেরূপ প্রাঞ্জল, সেইরূপ সুখবোধ্য। এই সকল গ্রন্থে যদিও সেই সময়ের প্রচলিত ভাষার কিছু কিছু নিদর্শনও আছে, কিন্তু তাহা হইলেও সে সময়ের পক্ষে মৃত্যুঞ্জয়ের এই ভাষা ও রচনা-প্রণালী বিশেষ প্রশংসনীয়ই বলিতে হইবে। নমুনা দিলাম :—

"একদিবস রাজা অবন্তীপুরীতে সভা মধ্যে দিব্য সিংহাসনে বসিয়াছেন। ইতোমধ্যে এক দরিদ্র পুরুষ আসিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইল, কথা কিছু কহিল না। তাহাকে দেখিয়া রাজা মনের মধ্যে বিচার করিলেন, যে লোক যাত্রা করিতে উপস্থিত হয়, তাহার মরণ কালে যেমন শরীরের কম্প হয়, এবং মুখ হইতে কথা নির্গত হয় না, ইহার সেই মত দেখিতেছি। অতএব বুঝিলাম ইনি যাত্রা করিতে আসিয়াছেন, কহিতে পারেন না।" —(বত্রিশ সিংহাসন)।

মৃত্যুঞ্জয়ের পূর্ব্বে বাঙ্গালা গদ্যের রচনা-প্রণালী কিরূপ ছিল আমরা পূর্ব্বে উহার উল্লেখ করিয়াছি। সেই রচনা-প্রণালীর তুলনায় মৃত্যুঞ্জয়ের গ্রন্থের ভাষা ও রচনা-প্রণালী যে অনেক উৎকৃষ্ট তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের দুর্ভাগ্য যে তাঁহার ঐ ভাষা ও রচনা-প্রণালী তৎকালীন ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট যথেষ্ট সমাদর লাভ করিলেও এদেশের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের নিকট উহা বিশেষ রূপে উপেক্ষিত হইয়াছিল। বোধ হয় তৎকালীন পণ্ডিত সমাজ সেজন্য তাঁহাকে সমাজেও কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ করিয়াছিলেন। কেননা ইহার পরে তিনি "প্রবোধ-চন্দ্রিকা" নামে যে গ্রন্থখানি রচনা করেন, উহার ভাষা ও রচনা-প্রণালী দেখিলেই মনে হয় যেন পণ্ডিত সমাজের বিষদন্ত ভগ্ন করিবার জন্যই এই গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় ১৮১৩ অব্দে প্রবোধ-চন্দ্রিকা লিখিত হয়। গ্রন্থখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। স্তবক নামে ইহার চারিটী ভাগ আছে; আবার প্রতি ভাগের কুসুম নামে অনেকগুলি অবান্তর অংশ আছে। এই গ্রন্থের প্রথমেই ভাষার প্রশংসা; পরে বিক্রমাদিত্য তনয় বৈজপাল রাজা স্বীয় পুত্র শ্রীধরাধরকে বিদ্যাশিক্ষা করাইবার অভিলাষে তৎসম্বন্ধে বিদ্যার অনেক রূপ গুণানুবাদ করিয়াছেন। তৎপরে আচার্য্য প্রভাকরের নিকট বিদ্যা শিক্ষার্থে পুত্রকে সমর্পণ করিয়াছেন। প্রভাকর রাজপুত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, ছন্দ, স্মৃতি, ন্যায়, সাংখ্য, জ্যোতিষ, রাজনীতি, সমাজ-নীতি, জ্ঞাতিতত্ত্ব প্রভৃতি কত বিষয় যে উপদেশ দিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। এই একখানি গ্রন্থ পাঠ করিলেই বাঙ্গালার অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ হইতে পারে।

১৮৩৩ খৃঃ অব্দে এই গ্রন্থখানি প্রথম মুদ্রিত হয়। কিন্তু তৎপূর্ব্বে সেই বৎসরেই গ্রন্থকারের মৃত্যু হওয়ায় বাঙ্গালার ইতিহাস প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মার্সম্যান সাহেব (J. C. Marshman) ইংরাজীতে ঐ গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াদেন। তিনি ভূমিকায় গ্রন্থকারের অগাধ পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্র জ্ঞানের এবং গ্রন্থের নানারূপ রচনা ভঙ্গির ভূয়োভূয়ো প্রশংসা করিয়া পরিশেষে লিখিয়াছেন, "এই উপস্থিত গ্রন্থ যে ব্যক্তি বুঝিতে পারেন এবং ইহার লিপি-নৈপুণ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাঁহাকে বাঙ্গালা ভাষায় সম্যক ব্যুৎপন্ন বলা যাইতে পারে।"

দীর্ঘ-দীর্ঘ-সমাস-সমন্বিত অনুপ্রাস-বহুল দুর্ব্বোধ বাঙ্গালার লেখক বলিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের যে একটা দুর্নাম রহিয়াছে এবং বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যিকগণ সেকালের পণ্ডিতি রচনার নমুনা দিতে গেলেই মৃত্যুঞ্জয়ের যে সকল রচনা উদ্ধৃত করিয়া বঙ্গীয় পাঠকের ধৈর্য্য পরীক্ষা করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন এই প্রবোধচন্দ্রিকাই তাহার মূল। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের এই প্রবোধচন্দ্রিকা সমাস ও দুর্ভেদ্য শব্দরাশির দ্বারা রচিত হইলেও আমরা ইহার মধ্যে তাঁহার নানারূপ রচনা ভঙ্গী দেখিতে পাই। মৃত্যুঞ্জয় তাঁহার আশ্চর্য্য প্রতিভা বলে, ভাষার সকল রূপ গতি, সকল

রূপ পষ্টা স্বয়ং দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং সকলকে দেখাইয়া গিয়াছেন। একদিকে তাঁহার "শার্দ্দুলের ভয়ঙ্কর গর্জ্জনাকর্ণন বিসঙ্কট-বদন-ব্যাদন বিকট-দংষ্ট্রা-কড়মড়ি ঘন ঘন লাঙ্গুল ঘাত চট চট শব্দ ভীম লোচনদ্বয়ের ঘূর্ণনেতে" আমরা যেমন সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ি, তেমনই "তরুণী-স্তন-সুন্দর-ইন্দীবর কৈরব-কোরক সুন্দরী-মুখ মনোহর আন্দোলিত কুমুদরাজীর নির্ম্মল সুস্নিগ্ধ জল পুষ্করিণীর তটস্থলে বট বিটপী ছায়াতে নিদাঘ কালীন দিবাবসান সময়ে" যেন সত্য সত্যই আমরা শীতল সমীরণের স্পর্শে সুস্নিগ্ধ হইয়া উঠি।

মৃত্যুঞ্জয়ের পুস্তকগুলির মধ্যে আমরা ভাষার এতপ্রকার নমুনা দেখিতে পাই যে আমাদের মনে হয় যেন তিনি ঐগুলি আমাদের সম্মুখে সাজাইয়া রাখিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে পরবর্ত্তী সময়ে তোমাদের পক্ষে যেরূপ ভাষা উপযোগী হইবে মনে কর, তাহা ইহার মধ্য হইতেই বাছিয়া লইও। বাস্তবিকই আমরা তাঁহার রচনায় এখনকার শাখা-প্রশাখাময়ী বঙ্গভাষার সকল অঙ্গের অঙ্কুরই দেখিতে পাই। মৃত্যুঞ্জয় বঙ্গ গদ্যের একজন আদি গ্রন্থকার বলিয়া সামান্য নহেন। তাই সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের কথায় আমরাও বলি "মৃত্যুঞ্জয় যে সময়ে অপোগণ্ড বঙ্গ-গদ্যের লালন পালন ভার গ্রহণ করেন—তৎকালে সত্য সত্যই ভাষা পিতৃমাতৃ-হীনা বালিকার মত অনাদৃতা, ধূল্যবলুণ্ঠিতা, বিষয়ী ব্যক্তির অবহেলায় ম্রিয়মানা, সংস্কৃত পণ্ডিত মণ্ডলীর ঘৃণায় অবজ্ঞায় রোরুদ্যমানা। সেই সময়ে মৃত্যুঞ্জয়ের মত প্রতিভাশালী পণ্ডিত 'তুমি সমস্ত প্রাকৃত ভাষার মধ্যে উৎকৃষ্ট ভাষা' বলিয়া আদর করিয়া, গৌরব বাড়াইয়া, মুখ চুম্বন করিয়া, কোলে না লইলে এবং ক্রমাগত শৈশবকাল কোলে পীঠে করিয়া মানুষ না করিলে, আজি এই সাগর তরঙ্গের তেজ ধারিণী, অক্ষয় ভূষণে বিভূষিতা, হেম ভূষণে জড়িতা, বঙ্কিম ভঙ্গিম-শালিনী অপূর্ব্ব দেবীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া পবিত্র শ্রীচরণে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ করিতে পারিতাম না।"

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার যখন মৃত্যুশয্যায় শয়ান তখন সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাগারে বসিয়া এক তরুণ বয়স্ক ব্রাহ্মণ সন্তান পাঠ্য বহির্ভূত নানাবিধ গ্রন্থ অধ্যয়নে নিমগ্ন থাকিতেন। কেহই জানিত না যে এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান বঙ্গ সাহিত্যক্ষেত্রে এ যুগের জয়মাল্য গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন। এমন কি এই যুগের প্রধান পুরুষ, এশিয়া ও ইউরোপের সম্মিলিত সদ্ভাব-গরীষ্ঠ বীরপুরুষ, নব বঙ্গের উজ্জ্বল প্রভাত নক্ষত্র, অদ্ভুত প্রতিভাশালী মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, যিনি ১৮১৩ খৃঃ অব্দে মৃত্যুঞ্জয়ের "প্রবোধ-চন্দ্রিকা" প্রকাশিত হইবার পর হইতে ১৮৩০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই বিংশ বৎসর কাল ধরিয়া একের পর একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিতেছিলেন, তিনিও মনে করেন নাই যে, অচিরেই তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে এক বিরাট প্রতিভা অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার অসম্পূর্ণ কার্য্য সুসম্পন্ন করিবেন। বঙ্গদেশের অতি শুভক্ষণেই বিদ্যাসাগর মহাশয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বঙ্গের এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানের নাম আজ সমগ্র জগতে সুপরিচিত। তাঁহার নাম করিতে স্বতঃই মস্তক ভক্তিভরে নত হইয়া পড়ে।

১২২৭ সালের ১২ই আশ্বিন (১৮২০।২৬এ সেপ্টেম্বর) মঙ্গলবার দিবা দ্বিপ্রহরের সময় এই মহাপুরুষ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ঠিক দুই মাস বারদিন পূর্ব্বে ১২২৭ সালের ১লা শ্রাবণ শনিবার নবদ্বীপের সন্নিহিত চুপী গ্রামে বঙ্গদেশের আর একটী মহাপুরুষও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি খ্যাতনামা অক্ষয়কুমার দত্ত। বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের অতি শুভক্ষণে বিধাতা এই দুই জন মহাপুরুষকে একই সময়ে বঙ্গদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার ও রামমোহন রায়ের মধ্য দিয়া বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা গদ্য যে সুস্থতা, যে সর্ব্বাঙ্গীনতা, যে দেশপ্রাণতার অন্বেষণ করিতেছিল, তাহা একদিকে অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের মধ্য দিয়াই চরিতার্থ হইয়াছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আদর্শের সম্মিলন

ফলে, বাঙ্গালীর হৃদয়ে যে সত্য পিপাসা ও ভাবোৎসাহ সঞ্চিত হইয়াছিল এই দুই মহাপুরুষই তাহার প্রধান ফল।

পাঁচ বৎসর বয়সে গ্রাম্য পাঠশালায় ঈশ্বরচন্দ্রের বিদ্যারম্ভ হয়। পরে ১২৩৬ সালে তিনি কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হ'ন। তাঁহার পিতার অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না, সেজন্য তাঁহাকে নানা-প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া ছাত্রজীবন অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। এইরূপে ১৮৪১ খৃঃ অব্দে তিনি কলেজের পাঠ শেষ করিয়া বিদ্যাসাগর উপাধি প্রাপ্ত হ'ন। পাঠ সমাপন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা বেতনে হেডপণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে ৮০৲ টাকা বেতনে ঐ কলেজের হেড রাইটারের পদে নিযুক্ত হ'ন। ইহার পর ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় ৯০৲ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হ'ন। ১৮৫১ খৃঃ অব্দে শিক্ষাসমাজ তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বা অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রিন্সিপ্যালের পদ ছাড়া হুগলী, বর্দ্ধমান, নদীয়া ও মেদিনীপুর এই চারিটী জেলার স্কুল সমূহের ইন্সপেক্টারের পদও প্রাপ্ত হ'ন। তৎকালে তাঁহার মাসিক বেতন ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা হইয়াছিল। কিন্তু তিন বৎসরের মধ্যেই তেজস্বী বিদ্যাসাগর মহাশয় এক কথায় উক্ত দুইটী পদ পরিত্যাগ করেন। শিক্ষা বিভাগের তদানীন্তন ডিরেক্টার ইয়ং সাহেবের সহিত মনান্তরই ইহার একমাত্র কারণ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঐ পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহারের জন্য বঙ্গের তৎকালীন ছোটলাট হালিডে সাহেব বাহাদুর তাঁহাকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তেজস্বী ঈশ্বর-চন্দ্র বিবেকের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে সম্মত হইতে পারেন নাই। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় মেট্রপলিটন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮০ খৃঃ অব্দে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি, আই, ই, উপাধি প্রদান করেন।

হিন্দুসমাজে বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তন জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। ১২৬৩ সালে

তাঁহার চেষ্টায় বিধবা বিবাহের আইন প্রবর্ত্তিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র কেবল বিদ্যার সাগর ছিলেন না, তিনি দয়ার সাগর বলিয়াও খ্যাত ছিলেন। তাঁহার দয়ায় শত শত দরিদ্র পরিবার প্রতিপালিত হইত। তিনি একাধারে দয়া, ধর্ম্ম ও শিক্ষার মূর্ত্তিমান অবতার ছিলেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ২৯এ জুলাই (১২৯৮।১৩ই শ্রাবণ) মঙ্গলবার রাত্রি দুই ঘটিকার সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী সম্বন্ধে আর অধিক লিখিবার আবশ্যক নাই। বঙ্গদেশে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে বোধ হয় এরূপ কোন লোক নাই যিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের ঘটনাবলী অবগত নহেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন বহু ঘটনাপূর্ণ। সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র যে কত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। তবে স্থূলতঃ তিনটী বিষয়ের জন্য তিনি অমর হইয়া গিয়াছেন এবং বঙ্গদেশবাসী এই তিনটী বিষয়ের জন্য চিরকাল তাঁহার পুণ্যস্মৃতি গভীর শ্রদ্ধার সহিত হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহার সর্ব্বজন বন্দিত চরণযুগলে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলী নিবেদন করিবে। তিনটী বিষয়ের প্রথমটী তাঁহার সাহিত্য সেবা; দ্বিতীয়টী,—দেশের নরনারীর মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার; তৃতীয়টী তাঁহার সর্ব্বজীবে দয়া। প্রথমটীই আমাদের আলোচ্য।

বহু গ্রন্থ প্রণেতা স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় তাঁহার রচিত "বিদ্যাসাগর" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"বিদ্যাসাগর আর কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিলেও, তাঁহার অমৃতময়ী লেখনী বিনিঃসৃত গ্রন্থাবলীর গুণে তিনি চিরকাল বাঙ্গালা সাহিত্য সংসারে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের পিতা না হইলেও স্নেহময়ী মাতার ন্যায় উহার পুষ্টিকর্ত্তা ও সৌন্দর্য্য বিধাতা। তাঁহার যত্নে গদ্য-সাহিত্যের উন্নতি, পরিপুষ্টি ও সৌন্দর্য্য সাধিত হয়। দশভুজা দুর্গার প্রতিমার খড়, বাঁশ ও দড়ির উপর সামান্য মাটির কাজ হইয়াছিল। তিনি ঐ মাটি যথাস্থানে বিন্যস্ত করেন এবং মৃত্তিকাময়ী মূর্ত্তি নানা বর্ণে সুরঞ্জিত ও চিত্রিত বেশে সজ্জিত করিয়া দেবমণ্ডপ শ্রীসম্পন্ন করিয়া তুলেন।"

বঙ্গসাহিত্য গুরু বঙ্কিমচন্দ্রও ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় ঐরূপ কথাই লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই।" অন্য এক স্থানেও তিনি বলিয়াছেন—"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত ও গঠিত বাঙ্গালা ভাষাই আমাদের মূলধন। তাঁহারই উপার্জ্জিত সম্পত্তি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছি।" বঙ্কিমচন্দ্রের এই কয়টা কথায় বিনয় ও কৃতজ্ঞতা উভয়ই প্রকাশ পাইতেছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ব্বে বাঙ্গালা গদ্য পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার ও রাজা রামমোহন রায়ের হাতে অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু সে বাঙ্গালা গদ্যকে ঠিক গদ্য সাহিত্য বলা যায় না। সাহিত্যে কলা-নৈপুণ্য থাকিবে,— সে যে হাসাইবে, কাঁদাইবে, আনন্দে উৎফুল্ল করিবে, ক্রোধে উত্তেজিত করিবে, সুখের বন্ধু, দুঃখের সান্ত্বনা দাতা হইবে।— সে যে যৌবনের নিত্য সহচর, প্রৌঢ় বয়সের সান্ত্বনাদাতা ও বার্দ্ধক্যের আশ্রয়স্থল হইবে। চিত্রকর পটের উপর তুলিকার দ্বারা নানাবর্ণের রংকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া দিলে যেমন চিত্র অঙ্কন হয় না, তেমনি লেখক ভাষার দ্বারা কতকগুলি ভাবকে এলোমেলো ভাবে বর্ণনা করিলে সাহিত্য হয় না। চিত্রকর যেমন নানাবর্ণকে নানাভাবে মিশাইয়া, তুলিকার সাহায্যে পটের উপর তাহার যথোপযুক্ত প্রয়োগ করিয়া সৌন্দর্য্য মণ্ডিত চিত্রকলার সৃষ্টি করেন, তেমনই প্রকৃত সাহিত্যিক মানব হৃদয়ের নানা বিচিত্র ভাবকে নানা ভাবে বিন্যস্ত করিয়া একটা মধুর ছন্দঃস্রোত সর্ব্বত্র অব্যাহত রাখিয়া প্রকৃত সাহিত্যের সৃষ্টি করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এইরূপ প্রকৃত সাহিত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা।

বাসুদেব চরিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত প্রথম গ্রন্থ। ইহার পর ক্রমান্বয়ে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে বেতাল পঞ্চবিংশতি, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে শকুন্তলা ও বিধবা বিবাহ বিষয়ক পুস্তক, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে সীতার বনবাস, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ভ্রান্তি-বিলাস প্রভৃতি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্ব্বসমেত ৫২ খানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ১৭খানি

সংস্কৃত গ্রন্থ, পাঁচখানি ইংরাজী ও ৩০খানি বাঙ্গালা গ্রন্থ। এই ত্রিশখানি বাঙ্গালা গ্রন্থের মধ্যে ১৯খানি বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক। বর্ণ পরিচয় দুই ভাগ, কথামালা, বোধোদয়, আখ্যানমঞ্জরী, বঙ্গদেশের ইতিহাস প্রভৃতি পুস্তকগুলি এই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

বাসুদেব চরিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত প্রথম গ্রন্থ হইলেও এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত হয় নাই। বেতাল পঞ্চবিংশতিখানিই তাঁহার প্রকাশিত পুস্তক সকলের আদি গ্রন্থ। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সময় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষক সেই সময় ঐ গ্রন্থখানি লিখিত হয়। ভাষা বিষয়ে বেতালই বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ। বেতালের সমাগমেই বাঙ্গালা সাহিত্য এক অপূর্ব্ব নূতন শ্রী ধারণ করিল। বাঙ্গালী বুঝিল বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে কিশোরীর বাল্যলীলায় যৌবনের নবোদ্গম দেখা দিয়াছে। ইহার পর শকুন্তলা ও সীতার বনবাসে বিদ্যাসাগরের লিপি-চাতুর্য্য, রচনা-মাধুর্য্য ও পদ-লালিত্য দর্শনে পাঠকমাত্রেই মোহিত হইয়া গেলেন এবং চারিদিকে তাঁহার প্রশংসা বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িল। বাঙ্গালী জাতি সমস্বরে বলিয়া উঠিল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মমতাময় শান্তি জল লাভ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্য প্রাণ পাইয়াছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনা বাঙ্গালীমাত্রেরই নিকট সুপরিচিত, সুতরাং তাহা হইতে আর কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। পাঠক-পাঠিকাগণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনার আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন, তাঁহার রচনা-নৈপুণ্যের বিশেষত্ব এই যে তাঁহার যে লেখনী একদিকে সীতার বনবাস, শকুন্তলা, ভ্রান্তি-বিলাস রচনা করিয়া ভাষার কোমলতা ও মধুরতার সৃষ্টি করিয়াছে, সেই লেখনী আর একদিকে বিধবা বিবাহ প্রভৃতি শাস্ত্রসঙ্গত অসাধারণ পাণ্ডিত্য-পূর্ণ সমালোচনা গ্রন্থ সকল রচনা করিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যের বিচিত্রতা সম্পাদন করিয়াছে। আবার অন্যদিকে সেই লেখনীই ১ম ও ২য় ভাগ বর্ণ পরিচয়, কথামালা প্রভৃতি শিশুপাঠ্য গ্রন্থ সকল রচনা করিয়া ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। তাই তাঁহার জীবনী-লেখক শ্রদ্ধাস্পদ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন:—যাঁহার লেখনী একদিকে বর্ণ পরিচয়ের অক্ষর

অর্জ্জন করিয়াছে, অন্যদিকে বেতালের লালিত্য ও জীবন চরিতের গাম্ভীর্য্যের পরিচয় দানে সফলতা লাভ করিয়াছে, শত শত সাধুবাদে সে লেখনীর প্রশংসা পরিসমাপ্ত হয় না। সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় এই সারল্য-কোমলতা-গাম্ভীর্য্যের বিচিত্র মিলন মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার আর এক কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায়— , ; ! ? প্রভৃতি বিরাম, বিস্ময় বা জিজ্ঞাসার চিহ্নাদি ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার বেতাল পঞ্চবিংশতিতে এই সকল চিহ্ন ব্যবহার করেন। ঐ সকল বিরাম চিহ্নের অভাবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব রচনা পাঠ যে কিরূপ দুরূহ ছিল, তাহা পাঠ করিলেই সহজে অনুভূত হয়। এ বিষয়ে বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহার নিকট বিশেষ ভাবে উপকৃত ও ঋণী।

বাঙ্গালা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আর এক কীর্ত্তি— উৎকৃষ্ট সংবাদপত্র প্রকাশ। সাহিত্য-চর্চ্চায় লোকের প্রবৃত্তি জন্মাইবার ও লোকশিক্ষার পথ সুগম ও সহজ সাধ্য করিবার যত প্রকার উপায় আছে, তন্মধ্যে সংবাদপত্র প্রচার প্রধানতম একটী। বাঙ্গালা ভাষায় তখন ভাল সংবাদপত্র ছিল না। দুই একখানি যাহা ছিল, তাহার প্রবন্ধ সকল এরূপ কদর্থ ও কষ্টার্থপূর্ণ শব্দ সংযোগে রচিত হইত যে তাহা পাঠকের পক্ষে তৃপ্তি বিধায়ক হইত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা-সাহিত্যের এই অভাব দূরীকরণার্থে উৎকৃষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী "সোম-প্রকাশ" নামক সর্ব্বজন-প্রিয় সংবাদ পত্র প্রচার করেন। তিনি প্রথমে সারদাচরণ নামে সংস্কৃত কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ একটী বধির ছাত্রের হস্তে এই সংবাদপত্র প্রকাশের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। পরে প্রথিতনামা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের হস্তে ইহার পরিচালন ভার ন্যস্ত হয়। সোমপ্রকাশের প্রথম শ্রী সম্পাদনে বিদ্যাসাগর মহাশয় লেখনী ধারণ করিয়া ইহাকে সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। বেতাল পঞ্চবিংশতি যেমন বর্ত্তমান বাঙ্গালা গদ্য রচনার পথ-প্রদর্শক, সোম-প্রকাশ সেইরূপ সুরুচি-সঙ্গত উৎকৃষ্ট পদ্ধতি অনুসারে প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত সংবাদপত্র প্রচারের পথ-প্রদর্শক।

সোমপ্রকাশ প্রচারের ন্যায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারেও বিদ্যাসাগর মহাশয় যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সময় যখন যে কাগজে লিখিতেন, তখন সেই কাগজই লোকের আদরের জিনিস হইত। এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সংশ্রব হইতেই অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হয়। ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে প্রাতঃস্মরণীয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের যত্নে কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের অন্তর্ভূক্ত তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয় বাবু উভয়েই ওই সময় যথাক্রমে উক্ত পত্রিকার প্রবন্ধ নির্ব্বাচন সমিতির (পেপার কমিটী) সভ্য ও সম্পাদক রূপে আবির্ভূত হ'ন। সেই সূত্রেই দু'জনের পরিচয় হয়; এবং এই পরিচয় ক্রমে প্রগাঢ় সৌহার্দ্দে পরিণত হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত অক্ষয়কুমারের পরিচয় বাঙ্গালা সাহিত্যের অপূর্ব্ব শুভ-সংযোগ।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী-প্রণেতা শ্রদ্ধেয় বিহারীলাল সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন—"এ শুভ সংযোগের দিন বাঙ্গালীর চিরস্মরণীয়। উভয়েই বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টিসাধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। আডিসন্ ও ষ্টীলের শুভ সংযোগ ইংরাজী সাহিত্য প্রসারের শুভ লক্ষণ ভাবিয়া আজিও বিলাতবাসী ইংরাজ আনন্দে উৎফুল্ল হ'ন। হয়তো অনেক আধুনিক ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালী এই শুভ সংযোগের দিনকে জাতীয় উৎসবের দিন বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু বাঙ্গালার অক্ষয়-কুমার ও বিদ্যাসাগরের এই শুভ সংযোগ কয়জন বাঙ্গালী মনে করেন?"

"সুধীরঞ্জন" নামক পত্রিকায় তৎকালে গুপ্ত কবি বঙ্গভাষার মুখে বলাইয়াছিলেন :—

"একাকী ঈশ্বর মম বিদ্যার সাগর।
তার যদি জননীর প্রতি থাকে টান,
ত্বরায় উঠিবে মম যশের তুফান।"

বঙ্গভাষার এই সগর্ব্ব উক্তি সফল হইয়াছে। বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের যে যুগ চলিয়াছে তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই যুগ। সাহিত্য সম্রাট

বঙ্কিমচন্দ্র সেই যুগের পরিচালক। আজ যে সুমধুর ও সুললিত ভাষা বঙ্গবাসীর কর্ণকুহরে অমৃত সিঞ্চন করিতেছে, যে ভাষার প্রবল শক্তি ও বহু বিভূতি দেখিয়া বাঙ্গালী মাত্রেই আজ আনন্দিত যে ভাষার গাম্ভীর্য্য সম্ভূত গৌরব বর্দ্ধনে অতুল প্রতিভাসম্পন্ন বঙ্কিমচন্দ্র লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার তুলিকাগ্রে যে ভাষা অনুপম সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছে, আজ যাঁহার সেবায়, বঙ্গের বহুসংখ্যক সুসন্তান নিযুক্ত, বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সে ভাষা গঠন করিয়াছেন, সে ভাষার পারিপাট্য সাধন করিয়াছেন, আর সে ভাষার অবশদেহে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন। তিনি নিজের শোণিত কিছু কিছু পাত করিয়া, বহু চিন্তা ও বহু শ্রম স্বীকার করিয়া নিজের কন্যা নির্ব্বিশেষে এই ভাষাকে পালন করিয়াছেন।

মেদিনীপুরের সৌভাগ্য এই ঈশ্বরচন্দ্র তাহারই সন্তান। উনবিংশ শতাব্দীতে এই একটীমাত্র সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিয়া মেদিনীপুর আজ সমগ্র জগতে অতি উচ্চস্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় মেদিনীপুরের গৌরব, বঙ্গদেশের গৌরব, ভারতের গৌরব, সমস্ত প্রাচ্য ভূখণ্ডের গৌরব। আমরা আজ সেই মহাত্মার পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া জীবন সার্থক করিলাম এবং এই প্রবন্ধেরও উপসংহার করিলাম। ভিন্ন প্রবন্ধে নবযুগের গদ্য-সাহিত্যের সহিত মেদিনীপুরের সম্বন্ধ কতটুকু তাহা দেখাইব, আশা রহিল।

—:০:—